বাংলা জাতীয় মাসিক

পরওয়ানা

www.parwana.net

এপ্রিল ◆ ২০২৫

বাংলা জাতীয় মাসিক
পরওয়ানা
৩২তম বর্ষ ■ ৪র্থ সংখ্যা
এপ্রিল ২০২৫ ♦ চৈত্র-বৈশাখ ১৪৩১-৩২ ♦ শাওয়াল ১৪৪৬

পৃষ্ঠপোষক
মুহাম্মদ হুছামুদ্দীন চৌধুরী

সম্পাদকমণ্ডলীর সভাপতি
আহমদ হাসান চৌধুরী

সম্পাদক
রেদওয়ান আহমদ চৌধুরী

নিয়মিত লেখক
আবু নছর মোহাম্মদ কুতুবুজ্জামান
রহমান মুখলেস
মোহাম্মদ নজমুল হুদা খান
মারজান আহমদ চৌধুরী

বিভাগীয় সম্পাদক
মুহাম্মাদ উসমান গণি

সহ-সম্পাদক
মনজুরুল করিম মহসিন
মো. মাহমুদুল হাসান
জামান আহমদ

বিজ্ঞাপন ও বিপণন ব্যবস্থাপক
এস এম মনোয়ার হোসেন

প্রচ্ছদ ও অলংকরণ
আহসান মাহমুদ

যোগাযোগ
সম্পাদক, মাসিক পরওয়ানা
ফুলতলী কমপ্লেক্স ঢাকা
খিলগাঁও, ঢাকা-১২১৯
মোবাইল: ০১৭৯৩ ৮৭৭৭৮৮

সিলেট অফিস
পরওয়ানা ভবন
৭৪ শাহজালাল লতিফিয়া আ/এ
সোবহানীঘাট, সিলেট-৩১০০
মোবাইল: ০১৭৯৯ ৬২৯০৯০

parwanabd@gmail.com
www.parwana.net

মূল্য: ৩৫ টাকা

সূচিপত্র

তাফসীরুল কুরআন
আত-তানভীর/আল্লামা আব্দুল লতিফ চৌধুরী ফুলতলী ছাহেব কিবলাহ্ (র.)
অনুবাদ: মুহাম্মদ হুছামুদ্দীন চৌধুরী ০৩

সাহাবা
হযরত হুসাইন (রা.) এর সংক্ষিপ্ত পরিচিতি ও কারামত/মাওলানা মো. ছালিক আহমদ (র.) ০৬

অনুবাদ
কুরআন তিলাওয়াতের বাহ্যিক নীতিমালা/মূল: হুজ্জাতুল ইসলাম আবূ হামিদ আল গাযালী (র.)
অনুবাদ: ইমাদ উদ্দীন তালুকদার ০৮

প্রবন্ধ
সাহাবীদের নবীপ্রেমের অনবদ্য গল্প/মারজান আহমদ চৌধুরী ১০
পেশাগত বৈচিত্র্য : ইসলামী দৃষ্টিকোণ/আব্দুল্লাহ যোবায়ের ১২
আওরঙ্গজেব-মারাঠা সংঘর্ষের বিকৃত বয়ান ও মুসলিম বিরোধিতার প্ররোচনা/জুনাইদ আহমদ মাশহুর ১৪

আলোকপাত
গণতান্ত্রিক ইসলামী রাজনীতির সমস্যা/মুহাম্মাদ হুসাইন ১৭

সাক্ষাৎকার
কবি মাওলানা রূহুল আমীন খান-এর সাক্ষাৎকার ১৮

আন্তর্জাতিক
আবারও অভুক্ত গাযাবাসীর ওপর বোমাবর্ষণ : বিশ্ববাসী নীরব কেন?/এমিনা হোজিচ ২৬

মসনবী
দয়ালু খলীফা ও বেদুইন দম্পতি/ড. মাওলানা মোহাম্মদ ঈসা শাহেদী ২৮

নিয়মিত
এই মাসে এই চাঁদে ৩০
জীবন জিজ্ঞাসা ৩১
খাতুন ৩৩
বিজ্ঞান ৩৩
গতমাসের বাংলাদেশ ৩৪
কবিতা ৩৬
আবাবীল ফৌজ ৩৭
সম্পাদকীয় ০২

সম্পাদক কর্তৃক বি.এন টাওয়ার (৯ম তলা), ২৮/১ বি, দৈনিক বাংলা মোড়, মতিঝিল ঢাকা-১০০০ হতে প্রকাশিত এবং সানজানা প্রিন্টার্স, ৮১/১, নয়াপল্টন, ঢাকা-১০০০ হতে মুদ্রিত।

সম্পাদকীয়

نحمده ونصلي على رسوله الكريم– اما بعد

অতি অল্প কয়দিনের যুদ্ধ বিরতির পর ফিলিস্তিনে আবারো রক্ত ঝরছে। যুদ্ধ বিরতির চুক্তি ভঙ্গ করে নির্বিকার পৃথিবীর চক্ষুসমক্ষে সুস্থির গণহত্যা চালিয়ে যাচ্ছে অবৈধ দখলদার বাহিনী। বর্বরতার চরম পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করে দখলদার জায়োনিস্টরা ফিলিস্তিনের অবুঝ শিশুদের উপর পর্যন্ত নিধনযজ্ঞ অব্যাহত রেখেছে। জায়োনিস্টদের সন্ত্রাসকাণ্ডে ফিলিস্তিনের মানুষ খাদ্যের অভাবে ভুগছে। চরম ক্ষুধা, পানি ও বিদ্যুতের অভাব তৈরি করে ফিলিস্তিনীদের জীবন চরম দুর্বিষহ করে তোলা হচ্ছে। তদুপরি নারী ও শিশুদের নিরাপত্তাহীনতা ফিলিস্তিনীদের প্রতিটি মুহূর্তকে আতংকে নিমজ্জিত করছে। অবৈধ দখলদার বাহিনী এমন ভয়ংকর মানবতাবিরোধী কর্মকাণ্ড সংঘটিত করতে কার্যতঃ কোন বিরোধিতার মুখোমুখি তো হচ্ছেই না, উপরন্তু পশ্চিমা বিশ্বের নিরবচ্ছিন্ন সমর্থনে তারা প্রতিনিয়ত মদদপুষ্ট হচ্ছে। বিশ্বের বর্তমান বাস্তবতা আমাদের সামনে এক কঠিন প্রশ্ন উপস্থাপন করছে—মানবতা কি আসলে নির্দিষ্ট কিছু জাতি, ধর্ম, কিংবা ভূখণ্ডের জন্য একরকম, আর অন্যদের জন্য আরেক রকম? আজকের ভূরাজনীতি, শক্তিধর রাষ্ট্রগুলোর অবস্থান ও আন্তর্জাতিক সংগঠনগুলোর ভূমিকা বিশ্লেষণ করলে এটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, বিশ্বব্যাপী ন্যায়বিচার এবং মানবাধিকারের নামে একধরনের ভণ্ডামির জয়জয়কার চলছে। পশ্চিমা বিশ্ব নিজেদের "সভ্যতা" ও "মানবাধিকারের" ধারক-বাহক হিসেবে দাবি করলেও প্রায়োগিক ক্ষেত্রে এই মানবাধিকার নীতিগুলো কেবল তাদের স্বার্থ অনুযায়ী প্রয়োগ করা হয়। যেখানে মুসলিম বিশ্ব আক্রান্ত, সেখানে তাদের নিরবতা কিংবা প্রত্যক্ষ সমর্থন লক্ষণীয়। আমরা দেখেছি কিভাবে ফিলিস্তিনে শিশু ও নিরীহ নাগরিকদের রক্ত প্রবাহিত হচ্ছে, কিভাবে সিরিয়া, ইরাক, আফগানিস্তান, লিবিয়া—একটির পর একটি মুসলিম ভূখণ্ড ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে। অথচ জাতিসংঘ এবং তথাকথিত "আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়" কেবল নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করেছে। এই পরিস্থিতি আমাদের চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছে যে, বিশ্বশক্তিগুলোর মানবাধিকার ও ন্যায়বিচারের ধারণা আসলে দ্বিমুখী। একদিকে তারা মুসলিম বিশ্বকে "চরমপন্থা" বা "সহিংসতার" জন্য দোষারোপ করে, অন্যদিকে নিজেরাই যুদ্ধের নামে নির্বিচারে মানুষ হত্যা করে, রাষ্ট্র ধ্বংস করে এবং তথাকথিত 'মানবাধিকার' কিংবা 'গণতন্ত্র' প্রতিষ্ঠার নামে আগ্রাসন চালায়।

এই বাস্তবতার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে মুসলিম বিশ্বের নিজেদের ভবিষ্যৎ নিয়ে নতুন করে ভাবার প্রয়োজনীয়তা তীব্রতর হয়েছে। জাতিসংঘ কিংবা পশ্চিমা শক্তির মুখাপেক্ষী হয়ে কোনো সমাধান মিলবে না, বরং প্রয়োজন বৃহত্তর মুসলিম ঐক্য, স্বাধীন নীতিনির্ধারণী শক্তি এবং স্বনির্ভরশীলতা। মুসলিম দেশগুলোর উচিত নিজেদের মধ্যে বিভেদ ভুলে একটি শক্তিশালী অর্থনৈতিক ও কৌশলগত জোট গঠনের মাধ্যমে পশ্চিমা প্রভাব বলয় থেকে স্বাধীন হওয়া। এই লক্ষ্যে ডলার নির্ভরতা কমিয়ে নিজস্ব মুদ্রার মাধ্যমে বাণিজ্য চালু করা, যথাসম্ভব মুসলিম বিশ্বের মধ্যে বিনিয়োগ বৃদ্ধির মাধ্যমে অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতা জোরদার করা, আধুনিক প্রযুক্তি, গবেষণা এবং প্রতিরক্ষাক্ষেত্রে সক্ষমতা নিশ্চিত করা সহ সাংস্কৃতিক ও ইসলামী আদর্শগত পুনর্জাগরণের মত কর্মকৌশলের প্রতি মনোনিবেশ করা প্রয়োজন। সর্বোপরি, মুসলিম বিশ্বকে পশ্চিমা আধিপত্যের শামিয়ানা থেকে বের হয়ে নিজেদের অভিভাকত্ব নিজেদের মধ্যে ফিরিয়ে আনার ব্যাপারেই ভাবতে হবে, এছাড়া মুক্তির দিশা পাওয়া অসম্ভব।

আত্-তানভীর

আল্লামা আব্দুল লতিফ চৌধুরী
ফুলতলী ছাহেব কিবলাহ (র.)

অনুবাদ
মুহাম্মদ হুছামুদ্দীন চৌধুরী

إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ الْكِتَابِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا ۙ أُولَٰئِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارَ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ– أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَىٰ وَالْعَذَابَ بِالْمَغْفِرَةِ ۚ فَمَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ– ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ نَزَّلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ ۗ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى ۖ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ ۚ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ۗ ذَٰلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۗ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ–

অনুবাদ: আল্লাহ যে কিতাব অবতীর্ণ করেছেন যারা তা গোপন রাখে ও বিনিময়ে তুচ্ছমূল্য গ্রহণ করে তারা নিজেদের পেটে অগ্নি বতীত আর কিছুই পুরে না। কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাদের সঙ্গে কথা বলবেন না এবং তাদেরকে পবিত্র করবেন না। তাদের জন্য রয়েছে শোচনীয় শাস্তি। তারা-ই সৎপথের বিনিময়ে ভ্রান্ত পথ এবং ক্ষমার পরিবর্তে শাস্তি ক্রয় করেছে; আগুন সহ্য করতে তারা কতইনা ধৈর্যশীল। এটা এ কারণে যে, আল্লাহ সত্যসহ কিতাব অবতীর্ণ করেছেন এবং যারা কিতাব সম্বন্ধে মতভেদ সৃষ্টি করেছে, নিশ্চয়ই তারা দুস্তর মতভেদ রয়েছে। (সূরা বাকারা, আয়াত-১৭৪-১৭৬)

তাফসীর:

إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ الْكِتَابِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا ۙ أُولَٰئِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارَ

আল্লাহ তাআলা আহলে কিতাবের উপর যা অবতীর্ণ করেছেন তারা তা প্রকাশ এবং প্রচার করে না বরং গোপন করে। তারা হযরত মুহাম্মদ ﷺ এর নবুওয়াত ও আবির্ভাব সম্পর্কে এবং হিদায়াত সম্পর্কে জানা সত্ত্বেও তা প্রচার ও প্রকাশ করে না। হযরত কাতাদাহ (র.), রাবী (র.) এবং হযরত সুদ্দী (র.) হতে বর্ণিত।[১]

وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا আয়াতে بِهِ এর মধ্যে যে যমীর ه আছে তা এর পরিবর্তে এসেছে। তাহলে এখানে অর্থ হবে, তারা গোপনীয়তা বিক্রি করে। হযরত মুহাম্মদ ﷺ-এর নবুওয়াতের কথা প্রকাশ করে না; বরং তা গোপন করে সামান্য সম্পদের বিনিময়ে।[২]

হযরত আবূ জাফর (র.) বলেন, যেহেতু লোকেরা আল্লাহর কিতাবের পরিবর্তন এবং অর্থ বিকৃতি ও সত্য গোপনের বিনিময়ে কিছু সম্পদ দিয়ে থাকে, এজন্য তারা তা বিক্রি করে। এখানে اولئك বলতে ঐ সকল লোক বুঝানো হয়েছে যারা হযরত মুহাম্মদ ﷺ-এর সত্যতা ও মহত্ত্ব গোপন করার বিনিময়ে ঘুষ খায়। তারা যেন তাদের পেটের ভিতর আগুন ভর্তি করে। يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ অর্থাৎ এর বিনিময়ে তাদেরকে আগুনে নিক্ষেপ করা হবে।[৩]

وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

-আল্লাহ যে কিতাব অবতীর্ণ করেছেন যারা তা গোপন রাখে ও বিনিময়ে তুচ্ছমূল্য গ্রহণ করে তারা নিজেদের পেটে অগ্নি বতীত আর কিছুই পুরে না। কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাদের সঙ্গে কথা বলবেন না এবং তাদেরকে পবিত্র করবেন না। তাদের জন্য রয়েছে শোচনীয় শাস্তি।

কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাআলা তাদের সাথে স্নেহের সুরে কথা বলবেন না। তাদেরকে আল্লাহর নাফরমানী এবং কুফর হতে পবিত্রও করবেন না। তাদের জন্যে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি রয়েছে।

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَىٰ وَالْعَذَابَ بِالْمَغْفِرَةِ ۚ فَمَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ

ঐ সকল লোক যারা হিদায়াত ছেড়ে গোমরাহী, ক্ষমা ছেড়ে আযাব গ্রহণ করছে, তারা এমন জিনিস আহরণ করছে, যা দ্বারা তাদের জন্য আযাব অপরিহার্য হয়েছে, এ আযাব তাদেরকে কিয়ামতের দিন দেওয়া হবে এবং তারা এমন আমল ছেড়ে দিয়েছে, যার দ্বারা তারা অবশ্যই আল্লাহর ক্ষমা ও সন্তুষ্টি অর্জন করতে পারত।

فَمَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ তাদের আমলের কারণে যে আযাব দেওয়া হবে সেই আগুনের আযাব কতইনা কঠিন হবে!

এ তাবীলে সকল তাবীলকারকদের কথার মর্ম চলে আসে।

ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ نَزَّلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ ۗ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ

এ শাস্তি এজন্য যে, আল্লাহ তাআলা সত্যপূর্ণ কিতাব নাযিল করেন, কিন্তু ইয়াহুদী আলিমরা তাওরাত কিতাবে হযরত মুহাম্মদ ﷺ সম্পর্কে,

তার নবুওয়াত সম্বন্ধে যা পেত, তা লোকের কাছে প্রচার করত না বরং গোপন করত, অথচ তারা এ সত্য সম্পর্কে ছিল সম্পূর্ণ ওয়াকিবহাল। তাদের উদ্দেশ্য শুধু এ দুনিয়ার সম্পদ হাসিল করা। এটা এজন্য যে, তারা আল্লাহ তাআলার আদেশ পালন ও আনুগত্য করে না। এটাই হচ্ছে তাদেরকে পাক-পবিত্র না করা এবং তাদের সাথে কথা না বলার কারণ। তাদের জন্য শাস্তি নির্ধারণ করার কারণ আল্লাহ তাআলা আরো বলেন, আমি কিতাব ঠিক ঠিক পাঠিয়েছি কিন্তু তারা তা অস্বীকার করেছে এবং তর্ক-বিতর্ক সৃষ্টি করেছে। সুতরাং কিতাব সম্পর্কে তাদের বিরোধীতা তাদেরকে অনেক দূরে নিয়ে গেছে। অর্থাৎ ইয়াহুদী এবং নাসারাগণ কিতাব সম্পর্কে বিরোধ সৃষ্টি করছে। ইয়াহুদীরা হযরত ঈসা বিন মারইয়াম (আ.)-এর যে কাহিনী আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে বর্ণনা করেছেন, তা অস্বীকার করে। আবার নাসারাগণ এসবের কিছু সত্য বলে স্বীকার করে, আবার আর কিছু মিথ্যা মনে করে। আবার তারা সকলেই মিথ্যা বলে ঐসব আয়াতকে, যাতে মুহাম্মদ ﷺ-এর সত্যায়নের নির্দেশ রয়েছে। যেমন হযরত মুহাম্মদ ﷺ যে আখিরী নবী তা স্বীকার করে না। তাই তারা তর্ক-বিতর্ক করে সঠিক রাস্তা হতে অনেক দূরে সরে গেছে।[৪]

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى ۖ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ ۚ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ۗ ذَٰلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۗ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

-হে মুমিনগণ! যাদেরকে (ইচ্ছাকৃত অন্যায়ভাবে) হত্যা করা হয়েছে, তাদের ব্যাপারে তোমাদের জন্য কিসাস (বদলা নেওয়ার বিধান) ফরয করা হয়েছে- স্বাধীন ব্যক্তির বদলে স্বাধীন ব্যক্তি, গোলামের বদলে গোলাম, নারীর বদলে নারী। অতঃপর হত্যাকারীকে যদি তার ভাই (নিহতের অভিভাবক)-এর পক্ষ হতে শাস্তি লাঘব হিসেবে ক্ষমা করা হয়, তবে ন্যায়ানুগভাবে (রক্তপণ) দাবি করার অধিকার (সেই অভিভাবকের) আছে। আর উত্তমরূপে তা আদায় করা (হত্যাকারীর) কর্তব্য। এটা তোমাদের রবের পক্ষ হতে একটি ছাড় এবং রহমত। এরপরও কেউ সীমালংঘন করলে সে পীড়াদায়ক শাস্তির উপযুক্ত। (সূরা বাকারা, আয়াত-১৭৭)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى

এখানে كُتِبَ শব্দ ফরয এর অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। প্রশ্ন হলো নিহত ব্যক্তির ক্ষতিপূরণ হিসেবে হত্যাকারীকে হত্যা করা নিহতের উত্তরাধিকারীগণের উপর ওয়াজিব কি না? জওয়াব হচ্ছে, 'না'। বরং ক্ষমা এবং দিয়ত গ্রহণের ইখতিয়ার রয়েছে। মুফাসসিরীনের দৃষ্টিতে এ আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার কারণ হলো, রাসূল ﷺ এর সময় দুটি দল পরস্পরের মধ্যে যুদ্ধ করে একজন অন্যজনকে হত্যা করে। তখন রাসূল ﷺ তাদেরকে সন্ধি করার নির্দেশ দিলেন। একজন মহিলাকে অপর মহিলার দিয়তের পরিবর্তে ছেড়ে দেওয়া হয়।[৫]

এভাবে আযাদের পরিবর্তে গোলাম এবং মহিলার পরিবর্তে পুরুষ এর কিসাস নেওয়া জায়িয আছে নিম্নোক্ত আয়াতের মাধ্যমে।

وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا الخ.

কেউ অন্যায়ভাবে নিহত হলে আমি তার উত্তরাধিকারীকে এর প্রতিকারের অধিকার দিয়েছি। (সূরা বনী ইসরাঈল, আয়াত-৩৩)

এভাবে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, মুসলমান পরস্পর রক্তের মাধ্যমে ক্ষতিপূরণ দেবে। তাফসীরকারীগণ এ প্রসঙ্গে বিতর্ক করেন। তাদের মধ্যে কেউ কেউ বলেন, একটি সম্প্রদায়ের কারণেই এ আয়াত নাযিল হয়। জনৈক লোক অন্য সম্প্রদায়ের একজন গোলামকে হত্যা করেছিল, এখন দিয়ত আদায়ের জন্য সে লোকটিকে হত্যা করার কথা উঠল। কিন্তু অন্যান্য লোকেরা তার প্রতিবাদ করল। তারা বলল, তা হয় না। যেহেতু এ হলো আযাদ ব্যক্তি আর নিহত ব্যক্তি হলো দাস। শেষ পর্যন্ত ঐ দাস ব্যক্তির মনীবকে হত্যা করা হয়। অপরদিকে এক মহিলা অন্য এক দলের এক পুরুষকে হত্যা করেছিল। মহিলার অভিভাবকগণ মহিলার কাছ থেকে রক্তপণ আদায় করতে অর্থাৎ মহিলাকে কিসাস হিসেবে হত্যা করতে রাজী হলো না। বরং তারা মহিলার সম্প্রদায়ের পুরুষকে হত্যা করল। তখনই আল্লাহ তাআলা এ আয়াত নাযিল করেন। আল্লাহ তাআলা তাদেরকে জানিয়ে দিলেন, কিসাস তোমাদের জন্য অপরিহার্য করা হয়েছে। পুরুষের বদলে হত্যাকারী পুরুষ ছাড়া অন্য কেউ হবে না। মহিলার বদলে হত্যাকারিনী মহিলাকে হত্যা করা হবে। গোলামের বদলা হত্যাকারী গোলামকে হত্যা করতে হবে। আযাদ লোককে হত্যা করা যাবে না। এ নির্দেশ এজন্য দেওয়া হয়েছে, যেন এ কিসাস ছাড়া হত্যাকারীর উপর অন্য কোন যুলম করা না হয়।[৬]

الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ

-স্বাধীন ব্যক্তির বদলে স্বাধীন ব্যক্তি, গোলামের বদলে গোলাম, নারীর বদলে নারী।

হযরত শাবী (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি আল্লাহ তাআলার উপরোক্ত বাণী সম্পর্কে বলেন, এ আয়াত আরবের দু'টি গোত্র সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়। তারা পরস্পর অন্ধভাবে যুদ্ধে লিপ্ত হয়। তারা বলে, অমুক দাসের রক্তপণ আদায় করতে যুদ্ধ করছি এবং অমুক মহিলার রক্তপণস্বরূপ যুদ্ধ করছি। তখন আল্লাহ তাআলা এ আয়াত নাযিল করেন। হযরত কাতাদাহ (রা.) হতে এ হাদীসের মর্মার্থ বর্ণিত আছে, তবে তাতে আরও কিছু বর্ধিত আছে।[৭] তারপর আল্লাহ তাআলা সূরা মায়িদার নিম্নোক্ত আয়াতখানি অবতীর্ণ করেন-

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنفَ بِالْأَنفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ

আমি তাদের জন্য এতে বিধান দিয়েছিলাম যে, প্রাণের পরিবর্তে প্রাণ, চোখের বিনিময়ে চোখ, নাকের পরিবর্তে নাক, কানের পরিবর্তে কান, দাঁতের পরিবর্তে দাঁত এবং যখমের পরিবর্তে অনুরূপ যখম। (সূরা মায়িদা, আয়াত-৪৫)

হযরত কাতাদাহ (রা.) আল্লাহ তাআলার বাণী كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى সম্পর্কে আরও বলেন, তারা বলতো আমাদের পূর্ববর্তীদের মধ্যে দিয়ত ছিল না বরং হত্যা বা ক্ষমা করে দেওয়া এ দুটি ছিল। তখনই এ আয়াত নাযিল হয়। এ আয়াত অবতীর্ণ হয় ঐ সম্প্রদায়কে লক্ষ্য করে, যারা তাদের প্রতিপক্ষের চেয়ে সংখ্যায় বেশি ছিল। জনবল বেশি এমন সম্প্রদায়ের কোনো দাসকে হত্যা করা হলে তারা বলত, এ দাসের বিনিময়ে আমরা তাদের একজন স্বাধীন ব্যক্তিকে হত্যা না করে ছাড়ব না। আর যখন তাদের সম্প্রদায়ের কোনো নারীকে হত্যা করা হত, তখন বলত- এর বিনিময়ে অবশ্যই আমরা একজন পুরুষকে হত্যা করব। তখন নিম্নোক্ত আয়াত অবতীর্ণ হয়স্বাধীন ব্যক্তির বদলে স্বাধীন ব্যক্তি, গোলামের বদলে গোলাম, নারীর বদলে নারী।[৮]

হযরত সুদ্দী (র.) হতে বর্ণিত, দুটি গোত্রের মধ্যে হত্যাকাণ্ড সংগঠিত হয়েছিল। একদল মুসলিম এবং একদল জিম্মি (ট্যাক্স আদায়কারী)। যুদ্ধে তাদের মধ্যে আযাদ, গোলাম এবং মেয়েলোক নিহত হয়েছিল। রাসূল ﷺ উভয় দলের মধ্যে এভাবে সন্ধি করে দিয়েছিলেন যে, আযাদের পরিবর্তে আযাদ, গোলামের পরিবর্তে গোলাম এবং মহিলার

পরিবর্তে মহিলাকে কিসাস হিসেবে হত্যা করা হবে। হযরত সুদ্দী (র.) অন্য এক রিওয়ায়াতে বলেন, যারা হত্যাকাণ্ড সংগঠিত করেছিলেন তারা উভয় দল আনসার ছিলেন।[৯]

হযরত আলী বিন আবূ তালিব (রা.) বলেন, কোনো আযাদ ব্যক্তি কোনো গোলামকে হত্যা করলে সেক্ষেত্রে শর্তারোপ করা যাবে। গোলামের মনীব ইচ্ছা করলে বিনিময়ে স্বাধীন ব্যক্তিকে হত্যা করতে পারে। এভাবে কোনো গোলাম আযাদকে হত্যা করলে বা কোনো মেয়ে আযাদ পুরুষকে হত্যা করলে বদলা নেওয়া যাবে।[১০]

অন্য একদল তাবীলকারক বলেন, প্রথমে কাওমের মধ্যে প্রথা চালু ছিল যে, মহিলার বদলা পুরুষকে হত্যা করা যেত না বরং পুরুষের বদলা পুরুষ এবং মহিলার বদলা মহিলা হত্যা করা হত। অবশেষে وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ আয়াত অবতীর্ণ হলো। এর দ্বারা সকলের ক্ষেত্রে নির্দেশ বরাবর হয়ে গেল যেন প্রত্যেক হত্যাকারী হতে বদলা নেয়া যায়। হযরত ইবন আব্বাস (রা.) এ রিওয়ায়াত বর্ণনা করতঃ বলেন, আযাদ মহিলা ও পুরুষ এবং গোলাম পুরুষ ও মহিলা সকলকে النَّفْسَ بِالنَّفْسِ আয়াত সমান করে দিয়েছে। সুতরাং উল্লেখিত আয়াত الْحُرُّ بِالْحُرِّ এর মূল কথা প্রথমটিই প্রণিধানযোগ্য।[১১]

فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ

-অতঃপর হত্যাকারীকে যদি তার ভাই (নিহতের অভিভাবক)-এর পক্ষ হতে শাস্তি লাঘব হিসেবে ক্ষমা করা হয়, তবে ন্যায়ানুগভাবে (রক্তপণ) দাবী করার অধিকার (সেই অভিভাবকের) আছে। আর উত্তমরূপে তা আদায় করা (হত্যাকারীর) কর্তব্য।

হযরত ইবন আব্বাস (রা.) এ আয়াতের অর্থ বর্ণনা করতঃ বলেন, العفو অর্থ হচ্ছে قتل عمد তথা ইচ্ছাকৃত হত্যার বিনিময়ে দিয়ত তথা মুক্তিপণ গ্রহণ করা। فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ -এর অর্থ দিয়ত চাওয়ার সময় শরীআতসম্মতভাবে চাইবে।

হযরত ইবন আব্বাস (রা.) বলেন, দিয়ত যে কবূল করা হচ্ছে তাই ক্ষমা। أَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ -হত্যাকারী যেন বাকীটুকু উত্তমরূপে আদায় করে। হযরত মুজাহিদ (র.)-এর বর্ণনাও একই রকম।[১২]

হযরত রাবী (র.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন- যিনি দিয়ত পাওয়ার হকদার, তিনি তা সঠিকভাবে চাইবেন এবং আদায়কারী সদ্ভাবে আদায় করবেন।

ذَٰلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ

-এটা তোমাদের রবের পক্ষ হতে একটি ছাড় এবং রহমত।

কাতল করার পরিবর্তে দিয়তের হুকুম দেওয়া মানে যেন উম্মতের জন্য সহজ সমাজব্যবস্থা করে দেওয়া। কারণ অন্যান্য উম্মতের জন্য পূর্বে এ ব্যবস্থা ছিল না।

فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

-এরপরও কেউ সীমালংঘন করলে সে পীড়াদায়ক শাস্তির উপযুক্ত। অর্থাৎ দিয়ত গ্রহণ করার পরও যদি কেউ রক্ত প্রবাহিত করে অর্থাৎ কাতিলকে হত্যা করে তাহলে তার জন্য যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি রয়েছে।

হযরত ইবন যাইদ (রা.) বলেন, দিয়ত গ্রহণ করার পরও যদি হত্যাকারীকে হত্যা করে তাহলে তার জন্য যন্ত্রণা ও কষ্টদায়ক শাস্তির ব্যবস্থা রয়েছে।[১৩]

---

১. তাবারী, ৩/৩২৭-৩২৮; ২. তাবারী, ৩/৩২৮; ৩. তাবারী, ৩/৩২৯; ৪. তাবারী, ৩/৩৩৬; ৫. তাবারী ৩/৩৫৭; ৬. প্রাগুক্ত, তাবারী ৩/৩৫৮; কুরতুবী ২/২৪৫; ৭. প্রাগুক্ত, তাবারী ৩/৩৫৮-৯; প্রাগুক্ত, কুরতুবী ২/২৪৫; ৮. প্রাগুক্ত, তাবারী ৩/৩৫৯; ৯. প্রাগুক্ত, তাবারী ৩/৩৬০-১; ১০. প্রাগুক্ত, তাবারী ৩/৩৬১; ১১. প্রাগুক্ত, তাবারী ৩/৩৬২-৩; ১২. প্রাগুক্ত, তাবারী ৩/৩৬৭-৮; ১৩. প্রাগুক্ত, তাবারী ৩/৩৭৮।

বাংলা জাতীয় মাসিক
পরওয়ানা

- ধর্ম-দর্শন, মাসআলা-মাসাইল, ফাদ্বাইল ও আমালিয়াত বিষয়ে লিখুন
- ইতিহাস-ঐতিহ্য, সমাজ-সংস্কৃতি, সমসাময়িক, দেশজ ও আন্তর্জাতিক বিষয়ে তথ্য সমৃদ্ধ লেখা পাঠান
- মুসলিম মনীষী, আউলিয়াদের জীবন ও গৌরবময় অতীতের আলোকোজ্জ্বল কাহিনি তুলে আনুন আপনার লেখায়

প্রতি মাসের ১০ তারিখের মধ্যে পরবর্তী সংখ্যার জন্য নিম্নোক্ত ই-মেইলে লেখা পাঠাতে হবে
E-mail: parwanabd@gmail.com

পরওয়ানা-এর
গ্রাহক হওয়া যাচ্ছে
নিকটস্থ এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন

বার্ষিক চাঁদার হার

বাংলাদেশ	ঃ ৪০০ টাকা
ভারত	ঃ ১৫০০ টাকা
মধ্যপ্রাচ্যের সকল দেশ	ঃ ২০০০ টাকা
যুক্তরাজ্য ও ইউরোপের সকল দেশ	ঃ ৪০ পাউন্ড/ইউরো
যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডা	ঃ ৫০ মার্কিন ডলার

এজেন্সির নিয়মাবলি

- ফোন/ই-মেইল/হোয়াটসঅ্যাপ ও অফিসে যোগাযোগ করে চাহিদা জানালে এজেন্সি দেওয়া হয়
- ১০ কপির কমে এজেন্সি দেওয়া হয় না
- প্রত্যেক ৫ কপিতে ১টি সৌজন্য কপি দেওয়া হয়
- সরাসরি এজেন্টের কাছে পত্রিকা পৌঁছানো হবে
- আশেপাশের এজেন্টের ক্ষতি হবে না, এমন নিশ্চয়তা থাকতে হবে।
- যেকোনো সময় কর্তৃপক্ষ যে কারো এজেন্টশিপ বাতিল/পরিবর্তন করার ক্ষমতা রাখে। সেক্ষেত্রে গ্রাহকদের বিকল্প মাধ্যমে পত্রিকা পৌঁছিয়ে দেওয়া হবে

যোগাযোগ
বিজ্ঞাপন ও বিপণন ব্যবস্থাপক
মাসিক পরওয়ানা
ফুলতলী কমপ্লেক্স, খিলগাঁও, ঢাকা-১২১৯
সিলেট অফিস: পরওয়ানা ভবন, ৭৪ শাহজালাল লতিফিয়া আ/এ সোবহানীঘাট, সিলেট-৩১০০

হযরত ইমাম হুসাইন (রা.) এর সংক্ষিপ্ত পরিচিতি ও কারামত

মাওলানা মো. ছালিক আহমদ (র.)

নাম হুসাইন। কুনিয়াত বা উপনাম আবু আব্দিল্লাহ। পিতাঃ হযরত আলী (রা.)। মাতাঃ জান্নাতী রমণীকুলের সরদার হযরত ফাতিমা (রা.)। মহানবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রিয় দৌহিত্র। বেহেশতী যুবকদের সরদার। হিজরী চতুর্থ সনের শাবান মাসের পাঁচ তারিখ জন্মগ্রহণ করেন। তিনি হিজরী ৬১ সনের দশই মুহাররাম পবিত্র আশুরার দিন ইরাকের কুফাস্থ কারবালা ময়দানে কুখ্যাত ইয়াযীদের মদদপুষ্ট পাষণ্ড আব্দুল্লাহ বিন যিয়াদের বাহিনীর সাথে হক প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে আহলে বাইতের ১৩ জন মতান্তরে ১৯ জন লোককে নিয়ে অত্যন্ত মর্মান্তিকভাবে শাহাদাতবরণ করেন। তখন নবী বংশের একমাত্র সদস্য যিনি এ পাষণ্ডদের হাত থেকে রেহাই পেয়েছিলেন তিনি হলেন হযরত হুসাইন (রা.) এর ছেলে হযরত আলী বিন হুসাইন, যিনি যাইনুল আবিদীন নামেই ইতিহাসে সমধিক প্রসিদ্ধ।

তাঁর মর্যাদায় বর্ণিত হাদীস

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ لَمْ يَكُنْ أَحَدٌ أَشْبَهَ بِالنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِنْ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ وَقَالَ فِي الْحُسَيْنِ اَيْضًا كَانَ أَشْبَهَهُمْ بِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. (رواه البخارى)

-হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, হযরত হাসান ইবনে আলী (রা.) থেকে কেউ রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে অধিক সাদৃশ্যপূর্ণ ছিলেন না। অনুরূপ তিনি বলেন, হযরত হুসাইন (রা.)ও হুযূরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে অধিক সাদৃশ্যপূর্ণ ছিলেন। (বুখারী; মিশকাত, পৃষ্ঠা ৫৬৯)

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِيْ يَعْقُوْبَ سَمِعْتُ ابْنَ أَبِيْ نُعْمٍ سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ وَسَأَلَهُ عَنْ الْمُحْرِمِ قَالَ شُعْبَةُ أَحْسِبُهُ يَقْتُلُ الذُّبَابَ فَقَالَ أَهْلُ الْعِرَاقِ يَسْأَلُوْنَ عَنْ الذُّبَابِ وَقَدْ قَتَلُوْا ابْنَ ابْنَةِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُمَا رَيْحَانَتَايَ مِنْ الدُّنْيَا. (بخارى، ج-١، ص-٥٣٠)

-হযরত মুহাম্মদ ইবন ইয়াকূব (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি ইবন আবূ নু'মকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, আমি হযরত আব্দুল্লাহ ইবন উমর (রা.) কে বলতে শুনেছি, যখন একজন ইরাকবাসী প্রশ্ন করেছিল, বর্ণনাকারী শুবা বলেন, আমার মনে হয় এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করেছিল, ইহরাম অবস্থায় অর্থাৎ মুহরিম ব্যক্তি মাছি মারতে পারবে কি না? তখন হযরত আব্দুল্লাহ ইবন উমর (রা.) বললেন, ইরাকবাসী মাছি হত্যার মাসআলা জিজ্ঞাসা করছে অথচ তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের (স্নেহের) দৌহিত্র (হযরত হুসাইন রা.) কে নির্মমভাবে হত্যা করল, যার সম্পর্কে ও তাঁর ভাই হযরত হাসান (রা.) সম্পর্কে রাসূলে খোদা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, তাঁরা (দু'জন) হলেন ইহজগতের দু'টি সুগন্ধি ফুল।

(বুখারী, খণ্ড-০১, পৃষ্ঠা ৫৩০)

হযরত ইমাম হুসাইন (রা.) এর কারামত

لَمَّا قُتِلَ الْحُسَيْنُ مَكَثَتِ الدُّنْيَا سَبْعَةَ أَيَّامٍ وَالشَّمْسُ عَلَى الْحِيْطَانِ كَالْمَلَاحِفِ الْمُعَصْفَرَةِ وَالْكَوَاكِبُ يَضْرِبُ بَعْضُهَا بَعْضًا وَكَانَ قَتْلُهُ يَوْمَ عَاشُوْرَاءَ وَكَسَفَتِ الشَّمْسُ ذٰلِكَ الْيَوْمَ وَاحْمَرَّتْ آفَاقُ السَّمَاءِ سِتَّةَ أَشْهُرٍ بَعْدَ قَتْلِهِ ثُمَّ لَا زَالَتِ الْحُمْرَةُ تُرٰى فِيْهَا بَعْدَ ذٰلِكَ وَلَمْ تَكُنْ تُرٰى فِيْهَا قَبْلَهُ. وَقِيْلَ: إِنَّهُ لَمْ يُقْلَبْ حَجَرُ بَيْتِ الْمُقَدَّسِ يَوْمَئِذٍ إِلَّا وُجِدَ تَحْتَهُ دَمٌ عَبِيْطٌ وَصَارَ الْوَرَسُ الَّذِيْ فِيْ عَسْكَرِهِمْ رَمَاداً وَنَحَرُوْا نَاقَةً فِيْ عَسْكَرِهِمْ فَكَانُوْا يَرَوْنَ فِيْ لَحْمِهَا مِثْلَ النِّيْرَانِ وَطَبَخُوْهَا فَصَارَتْ مِثْلَ الْعَلْقَمِ وَتَكَلَّمَ رَجُلٌ فِي الْحُسَيْنِ بِكَلِمَةٍ فَرَمَاهُ اللهُ بِكَوْكِبِ مِنَ السَّمَاءِ فَطَمِسَ بَصَرُهُ– (تاريخ الخلفاء، ص–٥٤١، ما ثبت بالسنة، ص–٣٢٢)

وَاَخْرَجَ اَبُوْ نُعَيْمٍ فِى الدَّلَائِلِ عَنْ اُمِّ سَلَمَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ سَمِعْتُ الْجِنَّ تَبْكِىْ عَلٰى حُسَيْنٍ وَتَنُوْحُ عَلَيْهِ

-যখন হযরত হুসাইন (রা.) শাহাদাতবরণ করলেন। সাতদিন পর্যন্ত পৃথিবীর অবস্থা অস্বাভাবিক হয়ে গিয়েছিল। ১. সূর্যের আলো দেয়ালের উপর হলুদ বর্ণের চাদরের ন্যায় দৃশ্যমান হয়েছিল। অর্থাৎ সূর্য একেবারেই নিস্প্রভ হয়ে গিয়েছিল। ২. একটি তারকা আরেকটি তারকার উপর নিপতিত হচ্ছিল অর্থাৎ সাতদিন পর্যন্ত উল্কাবৃষ্টি হয়েছিল। ৩. তিনি শাহাদাতবরণ করেছিলেন মুহাররমের দশ তারিখ অর্থাৎ আশুরার দিন ষাট হিজরী সনে। সেদিন আকাশে সূর্যগ্রহণ দেখা দিয়েছিল। ৪. তাঁর শাহাদাতের পর একাধারে ছয় মাস পর্যন্ত আকাশের কিনারায় অত্যাশ্চর্যভাবে লাল রঙের আভা পরিলক্ষিত হয়েছিল। ছয় মাস পর তা ধীরে ধীরে বিলুপ্ত হয়েছিল। এরপরে কিংবা তাঁর শাহাদাতের পূর্বে এ আভা আর কখনো দেখা যায়নি। ৫. তাঁর শাহাদাতের দিন বাইতুল মুকাদ্দাসের পাথরের নিচ থেকে তাজা রক্ত বের হয়েছিল। ৬. তাঁকে হত্যাকারী যালিমদের সৈন্য বাহিনীতে যে 'ওরস' নামক তাজা ঘাস ছিল তা শুকিয়ে গিয়েছিল। ৭. হত্যাকারী যালিমরা একটি উট যবেহ করেছিল, তখন এ উটের গোশত থেকে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হতে দেখেছিল এবং উক্ত উটের গোশত পাকানোর পর সমস্ত গোশত তিক্ত হয়ে গিয়েছিল। ৮. যালিমদের জনৈক লোক হযরত হুসাইন (রা.) এর সমালোচনা করেছিল, যার কারণে আকস্মাৎ আকাশ থেকে একটি তারকা (উল্কা) এসে তার চোখে নিক্ষিপ্ত হলো এবং সাথে সাথে তার দৃষ্টিশক্তি বিলুপ্ত হতে লাগল। (তারীখুল খুলাফা, পৃষ্ঠা ১৪৫; মা সাবাতা বিসসুন্নাহ, পৃষ্ঠা ২২৩)

তাছাড়া হযরত আবূ নুআইম আদ দালাইলের মধ্যে হযরত উম্মে সালামা (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমি হযরত হুসাইন (রা.) এর শাহাদাতের কারণে জিনদের কান্নাকাটি ও মাতম শুনতে পেয়েছি।

হাফিযে হাদীস ইবন হাজার আসকালানী (র.)ও তাঁর তাহযীবুত তাহযীব গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে ৩৫৫/৪৫৪ পৃষ্ঠায় হুসাইন (রা.) এর উক্ত কারামতগুলো উল্লেখ করেছেন।

قَالَ خَلْفُ بْنُ خَلِيْفَةَ عَنْ اَبِيْهِ لَمَّا قُتِلَ الْحُسَيْنُ اِسْوَدَّتِ السَّمَاءُ وَظَهَرَتِ الْكَوَاكِبُ نَهَارًا–

-হযরত খালফ ইবন খালীফা তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন, যখন হযরত হুসাইন (রা.) শাহাদাতবরণ করলেন আসমান কালো বর্ণের হয়ে গিয়েছিল এবং দিনের বেলা নক্ষত্ররাজি প্রকাশিত হয়েছিল। অর্থাৎ এমন অন্ধকার নেমেছিল যার ফলে দিনের বেলায়ও তারকারাজি দেখা গিয়েছিল। (ইবন আসাকির)

عَنِ السُّدِّىِّ فَقُلْنَا مَا شَرَكَ فِىْ قَتْلِهِ اَحَدٌ اِلَّا مَاتَ بِأَسْوَءِ مِيْتَةٍ فَقَالَ مَا اُكَذِّبُكُمْ يَا اَهْلَ الْعِرَاقِ فَاَنَا مِمَّنْ شَرَكَ فِىْ ذَالِكَ فَلَمْ يَبْرَحْ حَتّٰى دَنَا مِنَ الْمِصْبَاحِ وَهُوَ تَنْقِدُ فَنَفِطَ فَذَهَبَ يُخْرِجُ الْفَتِيْلَةَ بِاِصْبَعِهِ فَاَخَذَتِ النَّارُ فِيْهَا فَذَهَبَ يُطْفِئُهَا بِرِيْقِهِ فَاَخَذَتِ النَّارُ فِىْ لِحْيَتِهِ فَعَدَا فَاَلْقٰى نَفْسَهُ فِى الْمَاءِ فَرَأَيْتُهُ كَاَنَّهُ حُمَمَةٌ. (تهذيب التهذيب، ص–٥٥٣/٤٥٣، ج–٢)

-ইমাম সুদ্দী থেকে বর্ণিত, আমরা একস্থানে হযরত হুসাইন (রা.) শাহাদাতের বিষয়ে আলোচনা করছিলাম যে, উক্ত ঘটনায় যারা অংশগ্রহণ করেছিল তারা সকলই অত্যন্ত লাঞ্ছিতভাবে মৃত্যুবরণ করেছে। এমতাবস্থায় মজলিশের মধ্য থেকে জনৈক ব্যক্তি বলে উঠল, হে ইরাকীরা! তোমরা কতইনা মিথ্যাবাদী, দেখ আমিও এ ঘটনায় জড়িত ছিলাম কিন্তু এখন পর্যন্ত আমি এ ধরনের লাঞ্ছনাময় মৃত্যু থেকে নিরাপদে আছি। এ কথাটি বলেই সে একটি প্রজ্বলিত বাতিতে তেল ঢালতে অঙ্গুলী দিয়ে ফিতা বের করা মাত্রই সমস্ত বাতিতে আগুন লেগে গেল। সে থুথু ও ফুৎকার দিয়ে আগুন নির্বাপিত করতে গিয়ে তার দাঁড়িতে আগুন লেগে গেল ফলে সে আগুন নেভাতে দৌড়াতে শুরু করল এবং দৌড়াতে দৌড়াতে পানিতে পড়ে গেল। ইতোমধ্যে আমি দেখলাম যে তার সমস্ত শরীর জ্বলে গিয়ে একটি কয়লার ন্যায় হয়ে গেল। (তাহযীবুত তাহযীব, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩৫৪-৩৫৫)

عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ قَالَ لَمَّا جِيْءَ بِرَأْسِ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ زِيادٍ وَأَصْحَابِهِ نُضِّدَتْ رُؤُوْسَهُمْ فِيْ رَحْبَةِ الْمَسْجِدِ فَانْتَهَيْتُ إِليهِم وَهُم يَقُوْلُونَ: قَدْ جَاءَتْ، فَإِذَا حَيَّةٌ قَدْ جَاءَتْ تُخَلِّلُ الرُّؤُوْسَ حَتّٰى دَخَلَتْ فِيْ مَنْخَرَي عُبَيْدِ اللهِ بنِ زِيَادٍ فَمَكَثَتْ هُنَيْهَةً، ثُمَّ خَرَجَتْ فَذَهَبَتْ ثُمَّ عَادَتْ فَدَخَلَتْ فِيْهِ وَفَعَلَتْ ذٰلِكَ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا– (اخرجه الترمذى وصححه)

-হযরত উমারা বিন উমাইর (র.) বর্ণনা করেন, যখন উবাইদুল্লাহ বিন যিয়াদ ও তার দোসরদের খণ্ডিত মস্তকসমূহ দামেশকের মসজিদের বারান্দায় সারিবদ্ধভাবে রাখা হয়েছিল, তখন আমি সেখানে পৌঁছলাম। এমতাবস্থায় উপস্থিত জনতা বলে উঠল, সে এসে গেছে। তখন আমি দেখলাম একটি সাপ এসেছে এবং রক্ষিত মস্তকসমূহের প্রতিটিকে শুকতে লাগল। শেষ পর্যন্ত উবাইদুল্লাহ বিন যিয়াদের নাক দিয়ে ভিতরে ঢুকে গেল এবং কিছুক্ষণ সেখানে অবস্থান করে বেরিয়ে আসল। এভাবে দু'বার অথবা তিনবার করল।

উক্ত হাদীসটি ইমাম তিরমিযী (র.) তার জামে তিরমিযীতে বর্ণনা করে তা সহীহ বলে আখ্যায়িত করেছেন।

ঐতিহাসিকভাবে প্রমাণিত যে, কারবালার মর্মান্তিক হত্যাযজ্ঞ যার নেতৃত্বে সংঘটিত হয়েছিল সে ছিল কুখ্যাত ইবন যিয়াদ। সে ও তার দোসররা যারা এ নৃশংস হত্যাকাণ্ডে জড়িত ছিল সকলেরই মৃত্যু হয়েছিল অত্যন্ত লাঞ্ছিতভাবে। যা হযরত হুসাইন (রা.) এর কারামতই প্রমাণ করে। ◘

কুরআন তিলাওয়াতের বাহ্যিক নীতিমালা

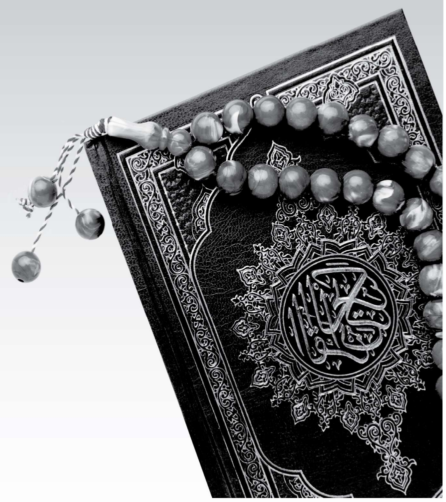

মূল: হুজ্জাতুল ইসলাম আবূ হামিদ আল গাযালী (র.)
অনুবাদ: ইমাদ উদ্দীন তালুকদার

কুরআন তিলাওয়াতের দশটি নীতিমালা রয়েছে। যেমন,

কুরআন তিলাওয়াতকারীর অবস্থা সংক্রান্ত

কুরআন তিলাওয়াতকারীর দায়িত্ব হলো, সে উযূ করে ভদ্রতা ও নম্রতার সাথে বসে বা দাঁড়িয়ে কিবলামুখী হয়ে তিলাওয়াত করবে। বিনয়ের সাথে মাথা ঝুঁকিয়ে বসবে, চারজানু বা হেলান দিবে না এবং অহংকারীর মত বসবে না। সে বসবে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য যেভাবে শিক্ষকের সামনে ছাত্ররা বসে। আর তিলাওয়াতের উত্তম অবস্থা হল, নামাযে দাঁড়িয়ে পড়বে আর তা মসজিদে পড়বে।[১] এটি হলো উত্তম আমল। যদি কেউ উযূহীন শয্যায় শায়িত হয়ে তিলাওয়াত করে, এতেও ফায়দা আছে। তবে তা উল্লিখিত প্রথম সূরত থেকে কম উত্তম। আল্লাহ তাআলা বলেন,

الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ
وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ

যাঁরা দাঁড়িয়ে, বসে ও শায়িত অবস্থায় আল্লাহকে স্মরণ করে এবং চিন্তা -ফিকর করে আসমান ও যমীন সৃষ্টির বিষয়ে।[২]

এখানে সব অবস্থার প্রশংসা করেছেন কিন্তু প্রথম অবস্থা দাঁড়ানোকে অগ্রে এনেছেন, অতঃপর বসা এবং শুয়ার অবস্থা পর্যায়ক্রমে উল্লেখ করেছেন। হযরত আলী (রা.) বলেন, যে নামাযে দাঁড়িয়ে তিলাওয়াত করে তার জন্য প্রত্যেক হরফে একশত নেকী রয়েছে আর যে নামাযে বসে তিলাওয়াত করে তার জন্য প্রত্যেক হরফে পঞ্চাশ নেকী রয়েছে। যে নামাযের বাইরে উযূ অবস্থায় তিলাওয়াত করে তার বিশ নেকী আর উযূ ছাড়া তিলাওয়াতে দশ নেকী রয়েছে।[৩] আর রাতের বেলা নামায হলো উত্তম কারণ রাতে কলব প্রশান্ত থাকে। আবূ যার গিফারী (রা.) বলেন, নিশ্চয়ই দিনে অধিক সিজদা উত্তম আর রাতে অধিক লম্বা নামায উত্তম।[৪]

তিলাওয়াতের পরিমাণ

তিলাওয়াতে কমবেশি পড়ার ক্ষেত্রে তিলাওয়াতকারীদের বিভিন্ন অভ্যাস রয়েছে। কেউ কেউ দিনে রাতে একটি খতম দিতেন। কেউ কেউ একদিনে দু'বার খতম আবার তিন খতম করতেন। আবার কেউ কেউ একমাসে একটি করে খতম করতেন। তবে তিলাওয়াতের পরিমাণ নিরূপণের জন্য উত্তম হলো যা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, যে তিনদিনের কম সময়ে কুরআন খতম করে, সে (তারতীলের সাথে না পড়তে পারার কারণে) কুরআনকে যথাযথ অনুধাবন করতে পারে না।[৫] কারণ তিনদিনে এরচেয়ে বেশি তিলাওয়াত করলে তারতীল তথা যথাযথ লম্বা, গুন্নাহ, উচ্চারণ সহকারে তিলাওয়াত করা সম্ভব হয় না। হযরত আয়িশা (রা.) কোনো এক ব্যক্তিকে অতিদ্রুত তিলাওয়াত করতে দেখে বলেন, এই ব্যক্তি তো না তিলাওয়াত করছে না নিরবতা পালন করছে।[৬] রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আব্দুল্লাহ ইবন আমর (রা.)কে আদেশ দেন প্রতি সাত দিনে একবার কুরআন খতম করার জন্য।[৭] এভাবে সাহাবাদের বৃহৎশ্রেণি প্রতি জুমুআয় কুরআন খতম করতেন। যেমন, উসমান ইবন আফফান (রা.), যাইদ ইবন সাবিত (রা.), আব্দুল্লাহ ইবন মাসঊদ (রা.) এবং উবাই ইবন কাব (রা.)।

খতম করার ক্ষেত্র চারটি স্তর রয়েছে। ১) একদিন ও এক রাতে খতম করা, তবে অনেকেই এই (দ্রুততার পদ্ধতিতে যথাযথ হক আদায় না হওয়ার আশঙ্কায়) মাকরূহ বলেছেন। ২) প্রতি মাসে এক খতম করা। এক্ষেত্রে প্রতিদিন এক পারা করে তিলাওয়াত করা। এটি বেশি কম হয়, যেরকম প্রথমটির ক্ষেত্রে বেশি পড়ার ক্ষেত্রে অতিরঞ্জন হয়ে যায়। তাই উভয়টির মাঝামাঝি আরও দুটি পদ্ধতি রয়েছে। ক) প্রতি সপ্তাহে একবার খতম করা, খ) প্রতি সপ্তাহে দুইবার পড়া, প্রতিদিন তিনভাগের একভাগ তিলাওয়াত করা। প্রতি সপ্তাহে দুটি খতমের ক্ষেত্রে উত্তম হলো, দিন ও রাতের খতম আলাদা আলাদা করা। দিনের খতম প্রতি সোমবার ফজরের দুই রাকআত সুন্নাত নামাযে বা পরে সম্পন্ন করা আর রাতের খতম প্রতি জুমুআবার মাগরিবের সুন্নাত দুই রাকআত নামাযে শেষ করা। দিনের খতম এভাবে ঊষালগ্নে শেষ করলে দিনের শুরুকে অভ্যর্থনা জানানো হয়ে যায় আর রাতের খতম এভাবে মাগরিবের সময় পড়লে রাতের শুরুটাকে অভ্যর্থনা জানানো হয়ে যায়, এর ফলে দিনের ফিরিশতারা খতমকারীর জন্য সকাল থেকে বিকাল পর্যন্ত দুআ করতে থাকেন আর রাতের ফিরিশতারা মাগরিব থেকে ফজর পর্যন্ত ফিরিশতারা খতমকারীর জন্য দুআ করতে থাকেন। এভাবে কুরআন খতমকারী ব্যক্তি দিনরাতের সারাটা সময় বরকত দ্বারা আচ্ছাদিত থাকে।

ব্যক্তিভেদে সময়ের বিবেচনায় কুরআন খতমের সংখ্যায় তারতম্য হয়। যেমন, যদি ব্যক্তি

নেককার তাসাওউফের তরীকার সবক পালনকারী হয়, তাহলে তার জন্য প্রতি সপ্তাহে দুই খতমের কম পড়া উচিত নয়। আর কুরআন তিলাওয়াতকারী তাসাওউফ-তরীকার অনুসারী ব্যাক্তিটি যদি কলবের যিকরকারী ও আল্লাহর ধ্যানে মগ্ন হয়ে মুরাকাবায় সময় পার করলে তার জন্য প্রতি সপ্তাহে দু'টির বদলে একটি খতম করার মাঝে দোষের কিছু নেই। আর কেউ কুরআনের মূল বয়ান অনুধাবন ও তার ফিকরের প্রয়োজনীয়তায় ব্যস্ত থাকলে তার জন্য প্রতি মাসে একটি খতম করাই যথেষ্ট।

কুরআন তিলাওয়াতে পরিমাণ ভাগ করা

যে প্রতি সপ্তাহে একবার কুরআন খতম করে, সে কুরআনকে সাতভাগে ভাগ করে নিবে। সাহাবাদের অনেকেই একাধিক অংশে কুরআনকে ভাগ করে নিতেন। বর্ণিত আছে, হযরত উসমান ইবন আফফান (রা.) জুমুআবারে সূরা বাকারা থেকে শুরু করে মায়িদা পর্যন্ত শেষ করতেন। শনিবারে সূরা আনআম থেকে সূরা হুদ, রবিবারে সূরা ইউসুফ থেকে সূরা মারইয়াম, সোমবারে সূরা তাহা থেকে ত্বা-সীন-মীম মূসা ও ফিরআউনের কাহিনী (সূরা কাসাস), মঙ্গলবার সূরা আনকাবুত থেকে সূরা সোয়াদ, বুধবার তানযীল (সূরা যুমার) থেকে সূরা রাহমান পর্যন্ত এবং বৃহস্পতিবার তারপর থেকে খতম শেষ করতেন।[৮] সাহাবী আব্দুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা.) কুরআন তিলাওয়াতকে এক সপ্তাহে খতম করার হিসাবে ভাগ করতেন, তবে ধারাবাহিকতায় নয়। বলা হয় আহযাবুল কুরআন তথা কুরআনের ভাগ সাতটি। যথা, প্রথম ভাগে তিন সূরা, দ্বিতীয় ভাগে পাঁচ সূরা, তৃতীয় ভাগে সাত সূরা, চতুর্থ ভাগে নয় সূরা, পঞ্চম ভাগে এগারো সূরা, ষষ্ঠভাগে তের সূরা সপ্তম ভাগে সূরা কাহফ থেকে শেষ পর্যন্ত পড়ে কুরআন খতম দিতেন।[৯] এভাবেই সাহাবায়ে কিরাম কুরআন খতমের জন্য তিলাওয়াতের পরিমাণকে ভাগ করে নিতেন। এক্ষেত্রে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকেও ভাগ করার ইঙ্গিত রয়েছে। তবে কুরআন খতমে সাহাবাদের ভাগ করা ছিলো পরবর্তীতে এক-পঞ্চমাংশ, এক-দশমাংশসহ অন্যান্য ভাগে বিভক্ত করারও পূর্বে, কারণ তা আরও পরে ভাগ করা হয়েছে।

সূত্রঃ
ইমাম গাযালী রাহিমাহুল্লাহ'র কালজয়ী 'ইহইয়াউ উলূমিদ্দীন' কিতাবের 'আদাবু তিলাওয়াতিল কুরআন' অধ্যায়ের 'ফাদীলাতুল কুরআন' পাঠের অনুবাদপাঠের অনুবাদ।

[১] হানাফী মাযহাবে নফল আমল লোকচক্ষুর অন্তরালে নিরিবিলি তথা ঘরে বা একান্তে পড়া উত্তম। (বুখারী: ১৮৫৮; আবূ দাউদ: ১০৪৪; বাহরুর রাইক ২/৮৭

[২] সূরা আলে ইমরান: ১৯১

[৩] আল্লামা মুত্তাকী আল হিন্দী (৯৭৫ হি.), কানযুল উম্মাল, হাদীস-৬৪৬৭

[৪] ইমাম আবূ তালিব মাক্কী রাহিমাহুল্লাহ (৩৮৬ হি.), কূতুল কুলূব ফি মুআমালাতিল মাহবুব, ১/৮৬ (শামেলা)

[৫] ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী রাহিমাহুল্লাহ (২০৯), সুনান তিরমিযী, হাদীস-২৯৪৯

[৬] ইমাম আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক রাহিমাহুল্লাহ (১৮১ হি.), কিতাবুয যুহদ ওয়ার রাকাইক, হাদীস-১১৯৬

[৭] ইমাম তাবারানী রাহিমাহুল্লাহ (৩৬০ হি.), আল মুজামুল কাবীর, হাদীস-১৩৩৪০

[৮] ইমাম আবূ তালিব মাক্কী রাহিমাহুল্লাহ (৩৮৬ হি.), কূতুল কুলূব ফি মুআমালাতিল মাহবুব, ১/৮৪ (শামেলা)

[৯] ইমাম আবূ তালিব মাক্কী রাহিমাহুল্লাহ (৩৮৬ হি.), প্রাগুক্ত কূতুল কুলূব ফি মুআমালাতিল মাহবুব, ১/৮৪ (শামেলা)

Al Arab Tailors
মো. আনোয়ার হোসেন
প্রোপ্রাইটর
আল আরব টেইলার্স
পাঞ্জাবী স্পেশালিস্ট
১১৮, করিম উল্লাহ মার্কেট (নিচ তলা)
বন্দর বাজার, সিলেট
01734-346601

সাহাবীদের নবীপ্রেমের অনবদ্য গল্প

মারজান আহমদ চৌধুরী

৬ষ্ঠ হিজরীতে মক্কার অদূরে হুদাইবিয়া নামক জায়গায় রাসূলুল্লাহ ﷺ ও মক্কাবাসীর মধ্যে একটি সন্ধি হয়। সন্ধির অন্যতম শর্ত ছিল, "মক্কা থেকে ইসলাম কবূল করে কেউ মদীনায় আসলে তাকে আবার মক্কায় ফেরত পাঠাতে হবে। কিন্তু মদীনা থেকে কেউ মক্কায় গেলে মক্কাবাসী তাকে ফেরত পাঠাবে না।" শর্তটি ছিল কুরাইশদের। সাহাবীরা কেউ এ শর্ত মানতে রাজি ছিলেন না। কিন্তু রাসূলুল্লাহ ﷺ মেনে নিলেন।

চুক্তি সাক্ষরিত হওয়ার পরই সেখানে এসে হাজির হলেন আবূ জান্দাল ইবন সুহাইল (রা.)। কেবল ইসলাম কবূল করার কারণে মক্কার এ তরুণ বহুদিন নিজঘরে আপন পিতার দ্বারা শিকলবন্দি ছিলেন। আজই তিনি শিকল ভেঙ্গে এসেছেন, নবীর সাথে যাবেন বলে। কিন্তু বাধ সাধলো তাঁর পিতার জাহিলি অহমিকা। আবূ জান্দালের পিতা আর কেউ নন; মক্কার কুরাইশদের পক্ষে হুদাইবিয়ার সন্ধিতে সাক্ষরকারী সুহাইল ইবন আমর। রাসূল ﷺ আবূ জান্দালকে সাথে নিয়ে যাওয়ার জন্য বহু অনুরোধ করলেন। কিন্তু তাতে সুহাইল ইবন আমরের মন গললো না। তখন রাসূল ﷺ বললেন, "ফিরে যাও আবূ জান্দাল। আল্লাহ তোমার এবং তোমার মতো মযলুমদের জন্য একটি পথ বের করে দেবেন।" চোখ মুছতে মুছতে মযলুম সাহাবী আবূ জান্দাল (রা.) পিতার কারাগারে ফিরে গেলেন।

ক'দিন পর মদীনায় এসে হাজির হলেন আরেক মযলুম সাহাবী আবূ বাসীর (রা.)। নিজ গোত্রের অত্যাচারের পিঞ্জর ভেঙ্গে বুকভরা আশা নিয়ে তিনি রাসূলের কাছে এসেছেন। তিনি মদীনায় পৌঁছাতেই পেছনে এসে উপস্থিত মক্কার দুই ব্যক্তি। তারা রাসূল ﷺ-কে বলল, আমরা আবূ বাসীরকে নিতে এসেছি। চুক্তি অনুযায়ী আপনি তাকে ফেরত দিন। ওদিকে আবূ বাসীর অনড়। তিনি ওই যুলমের মধ্যে আর ফেরত যাবেন না। রাসূল ﷺ তাঁকে বুঝালেন, "দেখ, আমাকে চুক্তি রক্ষা করতেই হবে। তুমি ফেরত যাও। আল্লাহ তোমার জন্য একটি পথ বের করে দেবেন।"

সাহাবীদের চোখ অশ্রুসিক্ত। অনেক কিছু কর তে পারতেন, কিন্তু রাসূল ﷺ করার অনুমতি দেবেন না। প্রিয়নবীর আদেশ মাথায় নিয়ে আবূ বাসীর ফিরে চললেন। যুল হুলাইফা এলাকায় যাওয়ার পর সঙ্গীদের একজনকে তিনি বললেন, "তোমার তরবারীটি খুব সুন্দর। একবার হাতে নিয়ে দেখা যাবে?" তরবারী হাতে নিয়েই চালিয়ে দিলেন তরবারীর মালিকের ওপর। সাথে থাকা অন্যজন ভয়ে মদীনায় চলে আসল। পেছনে আসলেন আবূ বাসীর। ঘটনা শুনে রাসূল ﷺ বললেন, "আফসোস, আবূ বাসীর তো যুদ্ধ বাঁধিয়ে দিল। যদি তার সাথে কিছু লোক থাকত!" আবূ বাসীর বললেন, "ইয়া রাসূলাল্লাহ, আপনি চুক্তির যিম্মাদারি থেকে মুক্ত। আপনি আমাকে ফেরত পাঠিয়েছেন। এখন আমার দায়িত্ব আমার নিজের কাছে।"

আবূ বাসীর জানতেন, চুক্তির কারণে রাসূল ﷺ তাঁকে মদীনায় রাখবেন না। আবার মক্কায় ফিরে যাওয়া মানে নিশ্চিত মৃত্যু। তিনি চললেন সমুদ্রের দিকে। আল-ঈস নামক উপকূলীয় এলাকায় গিয়ে দিন কাটাতে লাগলেন। ওই পথ দিয়ে কুরাইশদের ব্যবসায়ী কাফেলা সিরিয়ায় যাওয়া-আসা করত। আবূ বাসীরের কাছে তখন না ছিল ঘর-পরিবার, না খাদ্য, না পোশাক, না নিরাপত্তা। অবর্ণনীয় কষ্টে দিনগুলো কাটছিল। ক'দিন পর আবূ জান্দাল আবার পিতার শিকল ভেঙ্গে বের হলেন। মদীনায় না গিয়ে সোজা আল-ঈসে এসে আবূ বাসীরের সাথে যোগ দিলেন। বছরখানেকের মধ্যে মক্কা ও এর আশপাশ থেকে সত্তুরের অধিক মযলুম মুসলমান হিজরত করে আল-ঈসে চলে আসলেন। আবূ বাসীর ও আবূ জান্দাল সংকল্প করলেন, যাদের কারণে আমরা আমাদের নবীর কাছে যেতে পারছি না, তাদেরকেও আমরা শান্তিতে থাকতে দেব না। এরপর যখনই কুরাইশদের কোনো ক্যারাভান ওই পথ দিয়ে পার হতো, আবূ বাসীরের বাহিনী এসে তাদের ওপর হামলা করত এবং সবকিছু তছনছ করে দিত। মক্কাবাসী পড়ল মহা যন্ত্রণায়। এদের সাথে যে যুদ্ধ করবে, তারও উপায় নেই। এদের কোনো ঠিকানাই

নেই। আজ এখানে, তো কাল ওখানে। আবার বিচারও দেয়া যাচ্ছে না, যেহেতু তাঁরা রাসূল ﷺ এর জিম্মাদারি থেকে মুক্ত। বাধ্য হয়ে কুরাইশ নেতৃবৃন্দ রাসূল ﷺ এর কাছে আবূ বাসীর ও তাঁর বাহিনীকে ফেরত আনার অনুরোধ করল। রাসূল ﷺ অনুরোধ মেনে নিলেন এবং ওদেরকে ফিরিয়ে আনতে পত্র পাঠালেন।

বছর-দেড় বছর ধরে প্রতিকূল পরিবেশে দিন কাটিয়ে আবূ বাসীর তখন চরম অসুস্থ। আবূ জান্দাল বলেছেন, যেদিন রাসূল ﷺ এর পত্র এসে পৌঁছাল, আবূ বাসীর সেদিন শয্যাশায়ী। বাহকের হাত থেকে রাসূল ﷺ এর পত্র নিয়ে তিনি চুমু খেলেন। এরপর পত্রটি জড়িয়ে ধরেই পৃথিবীকে বিদায় জানালেন মযলুম সাহাবী আবূ বাসীর (রা.)। যে কারণে তাঁর এতো ত্যাগ, সে ত্যাগের ফল অন্যরা ভোগ করলেও তিনি নিজে করতে পারেননি। এ জীবনে প্রিয়নবীর সাথে থাকা হয়নি আবূ বাসীরের। চির-বিদ্রোহী সাহাবী আবূ বাসীর (রা.) প্রিয় নবীর সাথে সাক্ষাৎ না করেই আল-ঈসে সমাহিত হয়ে রইলেন। ঘটনাটি সহীহ বুখারী, সুনান আবূ দাউদ, বাইহাকীসহ বিভিন্ন কিতাবে বর্ণিত হয়েছে।

এর আগে, ৪র্থ হিজরীর একেবারে শুরুর দিকের কথা। সাহাবীরা তখনও উহুদ যুদ্ধের ধাক্কা সামলে উঠতে পারেননি। এমতাবস্থায় জানা গেল, হুযায়ল গোত্রের নেতা খালিদ ইবন সুফইয়ান গোপনে মদীনায় আক্রমণ করার ষড়যন্ত্র করছে। এ লক্ষ্যে সে বেদুঈন গোত্রগুলোর সাথে যোগাযোগ করে তার দল ভারি করছে। সংবাদ পেয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর সাহাবী আবদুল্লাহ ইবন উনাইসকে খালিদ ইবন সুফইয়ানের ষড়যন্ত্র নস্যাৎ করার জন্য প্রেরণ করলেন। অমিত সাহসী সাহাবী আবদুল্লাহ ইবন উনাইস মরুভূমি পাড়ি দিয়ে একাকী হুযায়ল গোত্রের আবাসভূমিতে পৌঁছালেন। এরপর সুযোগ বুঝে এক সুকৌশলী অভিযানের মাধ্যমে তিনি খালিদ ইবন সুফইয়ানকে হত্যা করতে সমর্থ হলেন। খালিদ ইবন সুফইয়ানকে হত্যা করার সাথে সাথে হুযায়ল গোত্রের ষড়যন্ত্র ধূলিসাৎ হয়ে গিয়েছিল। সফলভাবে কার্য সম্পাদন করে আবদুল্লাহ ইবন উনাইস যখন মদীনায় ফিরলেন, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ উপহারস্বরূপ তাঁকে নিজের লাঠি মুবারক দান করেছিলেন। বলেছিলেন, "এই লাঠি তোমার কাছে রেখ। এর দ্বারা কিয়ামতের দিন আমি তোমাকে পরিচয় করব।" আবদুল্লাহ ইবন উনাইস (রা.) জীবনভর এই লাঠি হাতছাড়া করেননি। এমনকি ইন্তিকালের আগে তিনি ওসীয়ত করে গিয়েছিলেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ এর লাঠি যেন তাঁর সাথে তাঁর কবরে দিয়ে দেওয়া হয়। তাই তাঁকে দাফন করার সময় ওই লাঠিও তাঁর সাথে কবরে রেখে দেওয়া হয়েছিল।

ষড়যন্ত্র নস্যাৎ হওয়ার কারণে হুযাইল গোত্র চরম ক্রোধান্বিত হলো এবং সাহাবীদের ওপর প্রতিশোধ নেয়ার পণ করল। সম্মুখযুদ্ধে মুসলমানদেরকে পরাজিত করার সামর্থ তাদের ছিল না। তাই তারা একটি ঘৃণ্য ষড়যন্ত্রের আশ্রয় নিল। তারা তাদের পার্শ্ববর্তী আদ্বাল ও কাররাহ নামক দুটি বেদুইন গোত্রের কিছু লোককে টাকা-পয়সা দিয়ে মদীনায় পাঠাল। এদের দায়িত্ব ছিল, কৌশলে কয়েকজন সাহাবীকে মদীনা থেকে বের করে এনে হুযায়ল গোত্রের হাতে তুলে দেয়া। ওই ভাড়াটে লোকেরা মদীনায় গিয়ে ইসলাম কবূল করার ভান করল এবং কয়েকজন সাহাবীকে নিজেদের এলাকায় নিয়ে আসতে চাইলো। তারা রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলল, আমাদেরকে কুরআন শেখানোর জন্য আপনি আপনার কয়েকজন সাহাবী আমাদের সাথে দিয়ে দিন। তাদের আগ্রহ দেখে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর প্রিয় সাহাবী আসিম ইবন সাবিত (রা.) এর নেতৃত্বে ১০ জন সাহাবীকে তাদের সাথে প্রেরণ করলেন। মদীনা শরীফ থেকে রওয়ানা দিয়ে সাহাবীরা যখন আর-রাজী নামক কূপের পাশে পৌঁছলেন, তখনই অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত কয়েকশো মানুষ তাঁদেরকে ঘেরাও করল। বুঝতে বাকি রইল না যে এটি কাফিরদের পাতানো ফাঁদ। সাহাবীরা তৎক্ষণাৎ পাশের একটি ছোট বালুর টিলায় আশ্রয় নিলেন এবং হাতে যা কিছু সরঞ্জাম ছিল, তাই নিয়ে কাফিরদের মুকাবিলা করতে শুরু করলেন।

ওই এলাকায় সুলাফা নামক এক মহিলা ছিল, যার দুই ছেলেকে সাহাবীদের দলনেতা আসিম ইবন সাবিত (রা.) উহুদ যুদ্ধে হত্যা করেছিলেন। তাই সুলাফা শপথ করেছিল, সে আসিমের মাথার খুলিতে মদ পান করবে। সে ঘোষণা দিয়েছিল, যে আসিমের মাথা এনে দিতে পারবে তাকে একশটি উট পুরস্কার দেয়া হবে। আসিম সেটি জানতেন। যুদ্ধ চলাকালীন যখন তিনি বুঝতে পারলেন আর বেঁচে ফেরা সম্ভব হবে না, তখন আল্লাহর দরবারে হাত উঠালেন, "হে আল্লাহ, আমাদের নবীর কাছে তুমি আমাদের সংবাদ পৌঁছে দিও। জানিয়ে দিও, আমরা লড়াই করে শহীদ হয়েছি। হে আল্লাহ, এই দিনের বেলা আমি তোমার জন্য আমার প্রাণ কুরবান করছি। অতএব রাতের বেলা তুমি আমার দেহকে রক্ষা করো। আমি আমার মাথার খুলিকে ওই মহিলার মদের পেয়ালা বানাতে চাই না।"

যুদ্ধ শেষে রাতের বেলা কাফিররা আসিম (রা.) এর দেহটি খুঁজতে শুরু করল। সবার মনে মনে একশো উট পুরস্কার পাওয়ার লোভ। এক সময় তারা টিলার ওপর তাঁর দেহ খুঁজে পেল। যেইমাত্র তারা দেহটি তুলার জন্য সামনে অগ্রসর হলো, ঠিক ওই সময় এক ঝাক মৌমাছি বা বোলতা এসে আসিমের দেহের ওপর ভীড় করল, যেন তারা দেহটিকে পাহারা দিচ্ছে। কাফিররা ব্যর্থ হয়ে আপাতত ক্ষান্ত দিলো। ভাবলো, দিনের বেলা এসে আসিমের মাথা কেটে নেওয়া যাবে। পরদিন সকালে তারা যখন তাঁর মাথা কাটতে গেল, তখন আচমকা এক পশলা বৃষ্টি হলো। বৃষ্টির পানিতে মরুভূমির বালুতে একটি খরস্রোতা নদী উৎপন্ন হলো এবং সোজা বয়ে চলে টিলার ওপরে উঠে আসিমের দেহকে ভাসিয়ে নিয়ে মরুভূমিতে গায়েব হয়ে গেল। আসিম আল্লাহর কাছে যে আকুতি জানিয়েছিলেন, আল্লাহ তাঁর বান্দার সেই আকুতির মান রেখেছিলেন। বিনা মেঘে মরুভূমিতে নদী তৈরি করে আল্লাহ তাঁর বান্দার দেহটি চিরতরে সরিয়ে নিয়েছিলেন লোকচক্ষুর অন্তরালে। আজকের দিন পর্যন্ত কেউ জানে না, আসিম ইবন সাবিত (রা.) এর দেহটি কোথায় আছে।

অবশেষে এক অসম যুদ্ধ শেষ হলো। ১০ জনের মধ্যে ৮ জন সাহাবী তথায় শাহাদাত বরণ করলেন। বাকি দুজন, খুবাইব (রা.) ও যায়িদ (রা.)-কে কাফিররা বন্দি করল। খুবাইবকে তারা বিক্রি করে দিলো একটি গোত্রের কাছে, যারা পরবর্তীতে তাঁকে শহীদ করেছিল। একইভাবে যায়িদকে তারা বিক্রি করে দিলো মক্কার কুরাইশদের কাছে। কুরাইশ নেতা সাফওয়ান ইবন উমাইয়া যায়িদ (রা.)-কে কিনে নিয়ে গেল হত্যা করার জন্য। মক্কায় তাঁকে বন্দি অবস্থায় দেখে কুরাইশ নেতা আবূ সুফইয়ান তাঁকে বলেছিলেন, "আমি তোমাকে আল্লাহর কসম দিচ্ছি, সত্য কথা বলো। তোমার কি মনে হচ্ছে না যে, যদি তোমার পরিবর্তে তোমার নবী এখানে বন্দি থাকতেন, আর তুমি তোমার পরিবারের সাথে থাকতে, তাহলে কত ভালো হতো?" যায়িদ (রা.) জবাব দিলেন, "আল্লাহর কসম, আমার নবী বন্দি হওয়া তো দূরের কথা, তাঁর পায়ে একটি কাঁটা বিদ্ধ হওয়ার চাইতেও আমি আমার বন্দিত্বকে অধিক পছন্দ করি।" জবাব শুনে আবূ সুফইয়ান বলেছিলেন, "মুহাম্মাদ ﷺ এর সাহাবীরা তাঁকে যতটা ভালোবাসে, দুনিয়ার কোনো মানুষ অন্য মানুষকে ততটা ভালোবাসে না।"

সাহাবায়ে কিরামের পুরো জীবন আল্লাহ, আল্লাহর রাসূল ﷺ ও আল্লাহর দ্বীনের প্রতি অকৃত্রিম ভালোবাসা ও অটুট অঙ্গীকারে পূর্ণ ছিল। তাঁদের অপরিসীম ত্যাগ ও কুরবানীর ফলে আজ আমরা ইসলাম পেয়েছি। তাঁরা ক্ষুধার কষ্টে পেটে পাথর বেঁধেছেন বলে, তাঁরা মরুভূমির উত্তপ্ত গরমে শরীরের হাড় গলিয়েছেন বলে, তাঁরা ঘোড়ায় চড়ে উত্তাল সাগর পাড়ি দিয়েছেন বলে, তাঁরা তাঁদের তাজা রক্তে কাফিরদের তরবারী রাঙিয়েছেন বলে আজ আমরা মুসলমান হওয়ার বড়াই করতে পারছি। তাঁদের এই ত্যাগ ও কুরবানীর বিনিময় দেওয়া আমাদের পক্ষে সম্ভব-ই নয়। এই বিনিময় স্বয়ং আল্লাহ তাআলা দেবেন, হাশরের ময়দানে দেবেন।

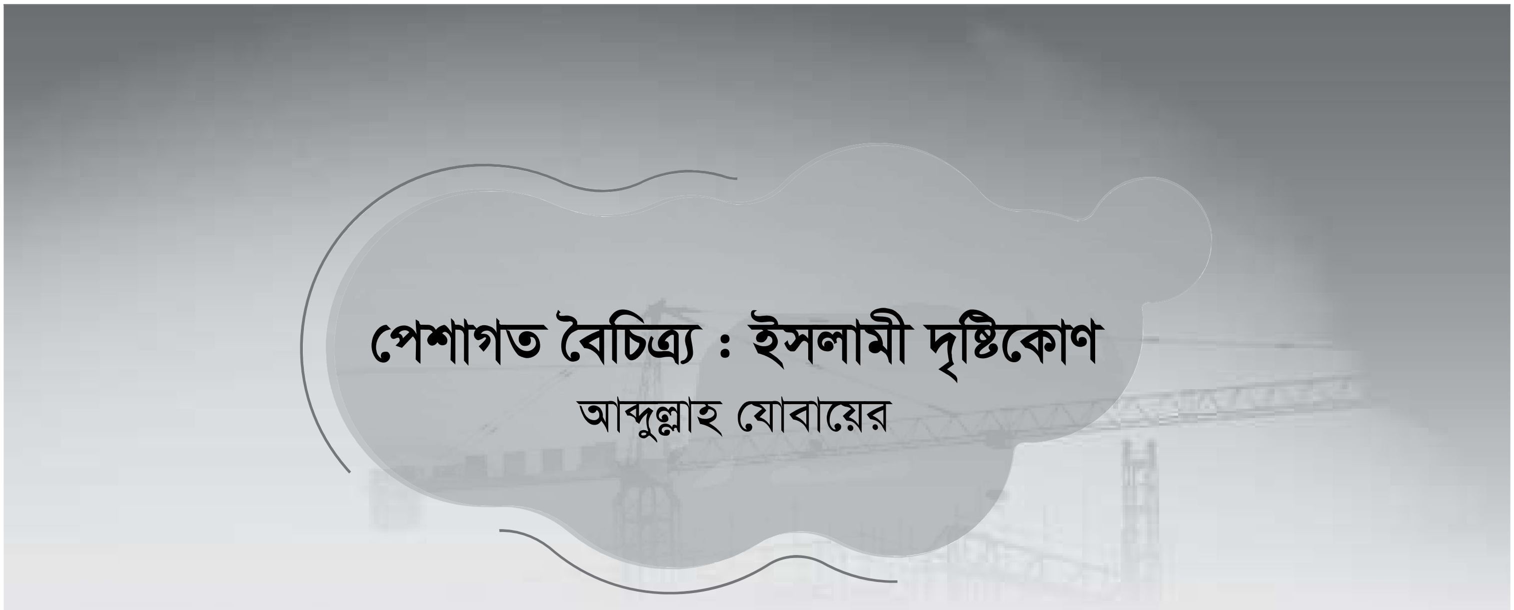

পেশাগত বৈচিত্র্য : ইসলামী দৃষ্টিকোণ

আব্দুল্লাহ যোবায়ের

পৃথিবীতে আল্লাহ নানা ধরনের, নানা পেশার মানুষ সৃষ্টি করেছেন। সবার ভালো লাগাও সমান নয়। কারও কৃষিকাজ ভালো লাগে আবার কারও সেই কৃষিপণ্য নিয়ে ব্যবসা করতে ভালো লাগে। কেউ ঘরবাড়ি বানানোর সরঞ্জাম তৈরি করেন আবার কেউ ঘরবাড়ি বানান। কেউ খাবার রান্না করেন আবার কেউ লাকড়ির যোগান দেন। এভাবে কত শ্রেণি-পেশার ব্যবস্থা যে আল্লাহ তাআলা রেখেছেন, তা গুণে শেষ করা যাবে না। মানুষের নানামুখী পেশার উপর ভিত্তি করেই প্রাচীনকাল থেকে বর্তমানকাল পর্যন্ত সমাজব্যবস্থা টিকে আছে। এজন্য মানুষের পারস্পরিক নির্ভরশীলতা অত্যন্ত বেশি। যেমন কারও পৃথিবীতে জীবন কাটাতে হলে প্রথমেই তার একটি ঘর দরকার হবে। এখানে ঘর তৈরি করতে দক্ষ শ্রমিকের প্রয়োজন। তার খাবারেরও প্রয়োজন হবে। খাবারের মাছ-মাংসের জন্য তাকে অবশ্যই জেলে এবং রাখালের দ্বারস্থ হতে হবে। আবার ভাত অথবা রুটির জন্য কৃষকের দ্বারস্থ হতে হবে। শুধু ঘর আর খাবারেই হবে না, তার জামা-কাপড় দরকার। এজন্য তাঁতশিল্পে দক্ষ মানুষ দরকার। অসুস্থ হলে তার চিকিৎসা লাগবে। তখন একজন চিকিৎসকের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য।

নবী-রাসূলগণ সমগ্র মানবজাতির আদর্শ। আমরা দেখতে পাই, তাঁরা সবাই নানা ধরনের পেশায় যুক্ত ছিলেন। যেমন আদম, শীস, ইউনুস ও ইয়াকূব (আ.) কৃষিকাজ করেছেন; ইবরাহীম, হুদ, সালিহ, শুআইব (আ.) পশুপালন করেছেন, দাউদ (আ.) কামারের কাজ করেছেন, নূহ ও যাকারিয়া (আ.) কাঠ সংগ্রহের কাজ করেছেন। প্রত্যেক নবী-রাসূলই কোনো না কোনো হালাল পেশার সাথে যুক্ত ছিলেন। আমাদের মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শৈশবে পারিশ্রমিকের বিনিময়ে মেষ চড়িয়েছেন। যখন তিনি পরিণত বয়সে পৌঁছেছেন, বাণিজ্যিক কাফেলা নিয়ে বিদেশে ব্যবসায়িক সফরে গিয়েছেন। আবূ সাঈদ আল খুদরী (রা.) বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজে উটকে খাদ্য দিতেন, ঘর ঝাড়ু দিতেন, জুতো মেরামত করতেন, কাপড়ে তালি দিতেন, ছাগলের দুধ দোহাতেন, খাদিমের সাথে খেতেন, সে ক্লান্ত হয়ে গেলে সাহায্য করতেন। বাজার থেকে পরিবারের জন্য জিনিসপত্র বয়ে আনতে তিনি লজ্জা পেতেন না। তিনি ধনী-গরীব সবার সাথে হাত মেলাতেন, আগে সালাম দিতেন, কোনো আপ্যায়ন অবজ্ঞা করতেন না, যদিও তা নিম্নমানের খেজুর দিয়েও হতো। তিনি যা পেতেন তাতেই সন্তুষ্ট থাকতেন, তিনি ছিলেন অত্যন্ত অমায়িক, মহানুভব চরিত্রের, তাঁর সঙ্গ ছিল আনন্দদায়ক, তাঁর মুখমণ্ডল ছিলো উজ্জ্বল, মুচকি হাসতেন, ভ্রুকুটি ছাড়াই তিনি বিষণ্ণ থাকতেন। তিনি ছিলেন কোনো ধরনের হীনতা ছাড়াই বিনয়ী এবং অপচয় ব্যতীত দানশীল। তাঁর হৃদয় ছিল কোমল ও প্রত্যেক মুসলমানের জন্য দয়ার্দ্র। তিনি কখনো পেটপুরে খাননি এবং কোনোকিছুর প্রতি লোভ নিয়ে হাত বাড়াননি।

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সৃষ্টির সর্বোচ্চ সম্মানিত ব্যক্তিত্ব। তিনি অবলীলায় উপরোক্ত কাজগুলো করেছেন। এগুলোকে মানহানিকর বা তাঁর সুউচ্চ মর্যাদার সাথে অবমাননাকর বিবেচনা করেননি। তাঁর আদর্শ অনুসরণ করে যুগে যুগে মুসলিম মনীষীরা হালাল শ্রেণিপেশায় যুক্ত থেকেছেন। কোনো কাজকেই তারা ছোটো করে দেখেননি।

বর্তমান যুগে আমরা ইসলামের শিক্ষা থেকে অনেকটাই সরে গিয়েছি এবং এতে আমাদের পরকালীন ক্ষতির পাশাপাশি জাগতিক ভিত্তিও নড়বড়ে হয়ে গেছে। পশুপালন, কৃষিকাজ, ছোটোখাটো ব্যবসা, দিনমজুরি-এসব বিষয়কে এখন সরকারি-বেসরকারি উচ্চ বেতনের চাকরির চেয়ে নিচু চোখে দেখা হয়। যেসব কাজ নবী-রাসূলগণ করে গেছেন, তা কি কখনও তুচ্ছ হতে পারে?

বাংলাদেশের একজন বিখ্যাত ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব ছিলেন আল্লামা আযীযুর রহমান নেছারাবাদী র. (কায়েদ ছাহেব)। তিনি ছারছীনা দরবার শরীফের মাহফিলে প্রায়ই জুতো পালিশের দোকান দিতেন এবং নিজেই কিছু পয়সার বিনিময়ে জুতো পালিশ করতেন। অথচ তখন তিনি ছারছীনা দারুচ্ছুন্নাত আলিয়া মাদরাসারই ভাইস-প্রিন্সিপাল পদে কর্মরত ছিলেন। মাহফিলে আগত অতিথিদের মধ্যে জাগতিক ও আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে তিনি যে শ্রেষ্ঠতম ধনী ছিলেন, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। এরপরও কোনো বৈধ পেশাকেই যে ছোট করে দেখতে নেই, সেটা বুঝানোর জন্য তিনি এমন করতেন। তাঁর ব্যক্তিগত রুমের সামনে সবসময় লেখা থাকতো-

ওগো মুসলমানের ছেলে,
কাজ করিলে মান যাবে তোর
কোন কিতাবে পেলে?

আমরা এখন দেখি, একজন কিছুটা শিক্ষিত হলে এবং কিছু সার্টিফিকেট অর্জন করলেই একটি উচ্চ বেতনের চাকরি করার জন্য সর্বোচ্চ চেষ্টা করতে থাকেন। চাকরির পদসংখ্যা যেহেতু সীমিত, তাই চাকরিপ্রার্থীদের বেশিরভাগই আশানুরূপ চাকরি না পেয়ে হতাশায় ভুগতে থাকেন। অনেকেই মানবেতর জীবনযাপন করে

বছরের পর বছর ধরে চাকরির চেষ্টা চালিয়ে যান। অথচ সুযোগ থাকার পরও তারা অন্য কোনো পেশায় নিজেকে যুক্ত করার কথা চিন্তাও করেন না। এটাকে নিতান্তই মানহানিকর এবং উচ্চশিক্ষার সাথে অসামঞ্জস্যশীল মনে করেন। অথচ পেশার সাথে একাডেমিক শিক্ষার সংযোগ যে থাকতেই হবে, তা তো নয়।

পূর্বসূরি বিখ্যাত আলিমগণ, যাদের লেখা বই পড়ে আমরা শিক্ষালাভ করি, ডিগ্রি অর্জন করি, তাদের পেশাগত বৈচিত্র্য দেখলে অবাক হতে হয়। তারা জ্ঞানার্জনের সময় জ্ঞানার্জন করেছেন, ছাত্রদের শিক্ষা দিয়েছেন, কালজয়ী সব বই লিখেছেন। কিন্তু যে পেশাই সহজ মনে হয়েছে, বেছে নিয়েছেন। সেটাকে তুচ্ছ দৃষ্টিতে দেখেননি।

হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.) নবী-রাসূলগণের পরে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম ব্যক্তিত্ব। তিনি কাপড়ের ব্যবসা করেছেন। আলী (রা.) কখনও কখনও দিনমজুরি করেছেন। মুহাজির সাহাবীদের অধিকাংশ ব্যবসায়ী এবং আনসার সাহাবীদের অধিকাংশ কৃষক ছিলেন। বিভিন্ন সাহাবীদের জীবনী পর্যালোচনা করলে পশুপালন, কৃষিকাজ, তাঁতের কাজ তথা বুননশিল্প, চামড়াজাত দ্রব্য তৈরি, খেজুর গাছের পাতা দিয়ে তোষক-বালিশ তৈরি, কাঠের আসবাবপত্র তৈরির কাজ, কসাইয়ের কাজ, কামারের কাজ (তরবারী, তির, বর্শা, হাঁড়ি-পাতিল, বর্ম-শিরস্ত্রাণ তৈরি), স্থানীয় বাজার ও দূরদেশে ব্যবসা, দোকানদারি, দিনমজুরিসহ নানামুখী পেশার অস্তিত্ব পাওয়া যায়। একবার প্রখ্যাত তাবিঈ ইমাম ইবন সিরীনের কাছে এক লোক আসার পর তিনি বললেন, ‘তুমি ব্যবসা করো না কেন? আবূ বকর কুরাইশদের (শ্রেষ্ঠ) ব্যবসায়ী ছিলেন।’ ইবন সিরীন (র.) এর নিজেরও ঘি-এর ব্যবসা ছিল।

যেসকল মুসলিম মনীষীর কালজয়ী গ্রন্থ আজ পুরো পৃথিবীর মানুষ পড়ে থাকে, তাঁদের নামের শেষে যুক্ত পদবি তাঁদের নানামুখী পেশাকে নির্দেশ করে। যেমন:

১. **الآجري** (আল আজুরী): পোড়া ইট কেনা-বেচার ব্যবসায়ী।

২. **الباقلاني** (আল বাকিল্লানী): মটরশুঁটির ব্যবসায়ী।

৩. **التوحيدي** (আত তাওহীদী): তাওহীদ জাতীয় খেজুরের ব্যবসায়ী।

৪. **الجصّاص** (আল জাস্‌সাস): দেয়াল প্লাস্টার, চুনকাম করা ইত্যাদির শ্রমিক।

৫. **الحاسب** (আল হাসিব): গণিতে পারদর্শী ব্যক্তিত্ব।

৬. **القفّال** (আল কাফফাল): তালা তৈরি বা তালা মেরামতের শ্রমিক।

৭. **الخرّاز** (আল খাররায): জুতা মেরামতকারী ও মুচি।

৮. **الفرّاء** (আল ফাররা): পশুর লোমের ব্যবসায়ী।

৯. **القطعي** (আল কিতঈ): টুকরো কাপড়ের ব্যবসায়ী।

১০. **القدوري** (আল কুদুরী): হাঁড়ি-পাতিলের ব্যবসায়ী।

বিশ্বখ্যাত আলিমদের প্রায় সবাই কোনো না কোনো পেশায় যুক্ত ছিলেন। এসব পেশা থেকে যে আয় হতো, সেগুলো তারা জ্ঞানার্জন ও জনকল্যাণমূলক কাজে ব্যয় করতেন। ইমাম আবূ হানীফা (র.) এর নিজের কাপড়ের ব্যবসা ছিল। তাঁর কারখানা থেকে এমন বহুমূল্যের কাপড় উৎপন্ন হতো, যা অন্য কোথাও পাওয়া দুর্লভ ছিল। ব্যবসা থেকে প্রাপ্ত অর্থ তিনি ছাত্রদের পেছনে ব্যয় করতেন। ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) ইমাম আবূ হানীফার অর্থসাহায্যে উচ্চতর শিক্ষা লাভ করেছিলেন। ইসলামের খিদমতেও ইমাম আবূ হানীফা বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যয় করতেন। ইমাম যায়িদ ইবন আলী (র.) যখন আব্বাসীয়দের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন, তিনি একাই তাকে ১২ হাজার দিরহাম পাঠিয়েছিলেন। ব্যক্তিগত ব্যবসা না থাকলে এমন বিপুল খিদমতের আনজাম দেওয়াটা সম্ভব হতো না।

সূফী সাধকগণ দুনিয়াবিরাগের চর্চা করতেন। কিন্তু এরপরও তাঁরা ব্যবসা বাণিজ্য করেছেন, যাতে আল্লাহ ছাড়া কারও কাছে যেন হাত পাততে না হয়। আবুল হুসাইন নূরী, জুনাইদ বাগদাদী, সিররি আস সাকতী, ফরীদুদ্দীন আত্তার প্রমুখের বাজারে দোকান ছিল। সায়্যিদুত তাইফা বা সূফীদের সর্দার হিসেবে প্রসিদ্ধ জুনাইদ বাগদাদী (র.) প্রতিদিন দোকানে ঢুকে পর্দা ঝুলিয়ে দিতেন এবং চারশত রাকাআত নামায পড়তেন। এরপর বাড়ি ফিরে যেতেন। এছাড়া অনেক সূফী বিভিন্ন পেশায় নিজেদের যুক্ত রেখেছিলেন। যেমন ইবরাহীম ইবন আদহাম (র.) আঙুরের ক্ষেত পাহারা দিতেন। আবূ হাফস আল হাদ্দাদ কামারের কাজ করতেন।

দেখা যাচ্ছে, জগদ্বিখ্যাত ইমাম ও সূফীসাধকগণ কেউই হালাল পেশা থেকে দূরে থাকেননি। কোনো কাজকে ছোটো করেও দেখেননি। তাঁরা বিপুল পরিমাণ ধর্মীয় জ্ঞানের অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও এই জ্ঞানকে কখনই অর্থ উপার্জনের মাধ্যম বানাননি। আমাদের বর্তমান সমাজচিত্র পুরোটাই উলটে গিয়েছে। কোনো আলিম ধর্মীয় বক্তব্য রেখে, অর্থ উপার্জন করলে আমরা তাকে বিরাট বড় আলিম মনে করে সমাদর করি এবং একই আলিম যদি বাজারে একটি দোকান দিয়ে বসেন, তাকে তাচ্ছিল্য করি। অথচ শেষোক্ত কাজটিই ছিল প্রকৃত সালাফদের অনুসরণ।

বর্তমান যুগে আমাদের সবচেয়ে বড় সমস্যা অনৈক্য। এই অনৈক্যের পেছনে অন্যতম অনুঘটক হলো আর্থিক দীনতা। ধর্মীয় গোষ্ঠীগুলোর পারস্পরিক দ্বন্দ্বের পেছনে আমরা যতই ধর্মীয় ব্যাখ্যা দাঁড় করাই না কেন, অধিকাংশ ক্ষেত্রে আর্থিক প্রাপ্তির বিষয়টি মুখ্য থাকে। তাই পেশাগত বৈচিত্র্য আনার মাধ্যমে আর্থিক অচলাবস্থা কাটিয়ে উঠতে পারলে আমাদের মন-মানসিকতা যেমন উদার হবে, তেমনি অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব-সংঘাত থেকেও আমরা অনেকাংশে মুক্ত থাকতে পারব।

রঙ হোক আপনাদের
ভালোবাসার, ভালো লাগার
মুদ্রণ ও শৈল্পিক কাজের
শিল্পবন্ধু

রঙ প্রিন্টার্স
সৃষ্টিতে শৈল্পিক কারুকাজ

০১৭৪২ ৬২৭৮৭৯
০১৭৬৪ ০৩৬২৯০
rangprinter@gmail.com
rangprintersbd@gmail.com

৩১৭, রংমহল টাওয়ার (৩য় তলা)
বন্দরবাজার, সিলেট

আওরঙ্গজেব-মারাঠা সংঘর্ষের বিকৃত বয়ান ও মুসলিম বিরোধিতার প্ররোচনা

জুনাইদ আহমদ মাশহুর

মেডিভেল ইন্ডিয়ায় মুঘল যুগ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি অধ্যায়। অধিকাংশ মুঘল সম্রাট ছিলেন সেমি-লিবারেল, যারা ধর্মীয় অনুশাসনের তুলনায় রাজ্য পরিচালনা ও অন্তর্দ্বন্দ্বে বেশি সময় অতিবাহিত করেছেন। কেউ কেউ ধর্মীয় সংস্কার চালু করলেও সেগুলো আকবরের 'দ্বীন-ই-ইলাহী'র মতো ভ্রান্ত পথ গ্রহণ করেছিল । ঠিক এই জায়গাটায় এসে সকলের থেকে আলাদা হন সম্রাট আওরঙ্গজেব আলমগীর বা বাদশাহ আলমগীর। তিনি ছিলেন ধর্ম পালনে সচেষ্ট, একজন মুমিন মুসলিম। ঠিক এই কারণটিই তাঁকে এতো সংখ্যক মানুষের কাছে খারাপ বানিয়েছে। অন্য ধর্মের মানুষের উপর যুলম করার মিথ্যা অপবাদের বোঝা নিয়ে তিনি নিজেই মাযলূম হয়ে আছেন ইতিহাসের পাতায় । বিশেষত, কট্টরপন্থি রাজপুত,মারাঠা হিন্দু সম্প্রদায়ের উপর তাঁর অত্যাচারের কাহিনী পুরো ভারতবর্ষে সমাদৃত, যার অধিকাংশই মিথ্যা, বানোয়াট এবং ঐতিহাসিকদের নিকট ভিত্তিহীন। গত ১৪ই ফেব্রুয়ারি মারাঠা বীর ছত্রপতি সম্ভাজীর জীবনচরিতের উপর নির্মিত চলচ্চিত্র "ছাবা" প্রকাশিত হয়। যেখানে আওরঙ্গজেবকে একজন নির্দয়,উন্মাদ ও অত্যাচারী মুসলিম শাসক হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছে। এর ফলে,ভারতের সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে নতুন করে মুঘল বিদ্বেষ জন্ম নেয়। হিন্দুরা ক্রোধের বশবর্তী হয়ে বিভিন্ন জায়গায় সংখ্যালঘু মুসলিমদের উপর আক্রমণ করে। এমনকি,ক্ষমতাসীন দল ভারতীয় জনতা পার্টির (বিজেপি) এমপি উদয়নরাজ ভোঁসলে,সম্রাটের কবর পর্যন্ত মাটিতে মিশিয়ে দেওয়ার ডাক দিয়েছেন।এখনপ্রশ্ন থেকেই যায়- আওরঙ্গজেব কি সত্যিই ভিন্নমতাবলম্বীদের প্রতি হিংস্র ছিলেন? নাকি ইতিহাসের নিরিখে মহান এই নেতাকে ভুলভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে?

প্রথমেই জানা আবশ্যক,মারাঠা সাম্রাজ্যের আবির্ভাবের ইতিহাস। মুঘলদের ভারতবর্ষ অধ্যুষিত করার পরপরই,হিন্দু নেতৃস্থানীয়রা হয়ে উঠেন মুঘল রাজাদের অত্যন্ত প্রিয়ভাজন। রাজপুত নেতাদের সাথে সম্পর্ক এমন পর্যায়ে পৌঁছায় যে, অনেক সম্রাট রাজপুত কন্যাদেরকে বিবাহ করেন। তাছাড়া সম্রাট হুমায়ুন থেকে শুরু করে স্বয়ং আওরঙ্গজেবের সময়ে এসেও হিন্দু নেতারা মুঘল প্রশাসনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতেন। এমনকি তাদের মনসবদারীও ছিলো অন্যদের তুলনায় অনেক বেশি। ফলে,মুঘল সাম্রাজ্যের বিশাল বিস্তৃত সময়কালে হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গার তেমন বড় কোন হদিস মিলে না, কিছু ছোটখাটো ঘটনা ব্যতিরেকে। আসল বিপত্তি ঘটে সম্রাট শাহজাহানের আমলে । বিজাপুরের সেনাপতি ছিলেন শাহজী ভোঁসলে । তাঁরই ঘরে জন্ম নেন শিবাজী। তাঁর মা জীজাবাঈ ছিলেন কট্টোর হিন্দুত্বমনা। এর বদৌলতে শিবাজী ছোট থেকেই মুসলিম ও মুঘল বিরোধী মানসিকতা নিয়ে বড় হন। হিন্দু-মুসলিম শান্তিতে বসবাস করলেও তীব্র সাম্রাজ্যবাদী মনোভাবের জন্য তিনি মুঘলদের সাথে লড়াইয়ে অবতীর্ণ হন। তিনি শাহজাহান পুত্রদের বিরোধিতার সময়,সুযোগ বুঝে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিদ্রোহের মাধ্যমে মারাঠা সাম্রাজ্য গঠন করেন এবং নিজেকে "ছত্রপতি" উপাধি দান করেন। ১৬৫৮ সালে আওরঙ্গজেব ক্ষমতায় আসার পরেই মারাঠাদের নতুন এই চ্যালেঞ্জ মুকাবিলা করতে বাধ্য হন।

শান্তিপ্রিয় আওরঙ্গজেব শিবাজীকে তার অধীনে আনার জন্য অনেক চেষ্টা করেছিলেন। ১৬৬৫ সালে পুরন্দরের যুদ্ধে শিবাজী পরাজিত হলে,সম্রাটের সাথে ১০ বছরের চুক্তি করেন এবং বিজাপুর অবরোধেও সম্রাটকে সাহায্য করেন যদিও তা ছিল সন্দেহজনক। অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই শিবাজী চুক্তিভঙ্গ করে আবারও বিদ্রোহী হয়ে উঠেন। জয় সিংহের মধ্যস্থতায় শিবাজীকে মুঘল সম্রাট আওরঙ্গজেবের দরবারে ডাকা হয়েছিল। তখন আওরঙ্গজেব তাকে পাঁচ হাজার মনসব দেওয়ার প্রস্তাব দেন। কিন্তু বিদ্রোহী শিবাজী তা নাকচ করে পালান এবং তার বিদ্রোহ চালিয়ে যান। তাছাড়া, শিবাজীর মৃত্যুর পর মারাঠা সাম্রাজ্যের অধিপতি হোন ছত্রপতি সম্ভাজী ভোঁসলে। তাঁর আমলেও সম্রাট কয়েক দফা শান্তিচুক্তির চেষ্টা করে ব্যর্থ হন।

ইতিহাস বিকৃতির এই প্রলেপ চূর্ণ করে দেয় সম্রাটের হিন্দুনীতি। তাঁর দ্বারা গৃহিত কিছু পদক্ষেপ যা আজ পর্যন্ত ইতিহাসে মানবতা ও শান্তির প্রতীক হিসেবে চর্চা হয়। কিছু বিশেষ পদক্ষেপসমূহ-

- হিন্দুদের মন্দিরের সংস্কারের অনুমতি প্রদান।
- রাজপুত নেতাদের উচ্চ প্রশাসনিক পদে নিয়োগদান।
- হিন্দু কর্মকর্তাদের জন্য সরকারি সুযোগ-সুবিধা প্রদান।
- ব্রাহ্মণ ও মন্দিরের জন্য কর মওকুফ এবং জায়গীর দান।
- নির্দিষ্ট অঞ্চলে হিন্দু ধর্মীয় উৎসব পালনের অনুমতি।
- হিন্দু জমিদার ও নেতাদের সাথে কূটনৈতিক সম্পর্ক বজায় রাখা।
- ধর্মীয় তহবিল তৈরি এবং তা থেকে বিভিন্ন হিন্দু প্রতিষ্ঠানকে সহায়তা।
- হিন্দু ব্যবসায়ীদের জন্য বাণিজ্যিক সুবিধা প্রদান।
- কিছু অঞ্চলে হিন্দু শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান পরিচালনার অনুমতি।
- হিন্দু আইন ও রীতিনীতি অনুযায়ী বিবাহ ও উত্তরাধিকার ব্যবস্থার অনুমতি।
- হিন্দু ধর্মীয় নেতাদের সম্মান প্রদান এবং কখনও কখনও আর্থিক সহায়তা।
- কৃষিকাজ ও ব্যবসার উন্নতির জন্য হিন্দু কৃষক ও ব্যবসায়ীদের কর রেয়াত।
- হিন্দু ধর্মীয় গ্রন্থ ও সাহিত্য সংরক্ষণে কিছু পদক্ষেপ।
- সমাজে শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখতে হিন্দুদের সাথে সমঝোতার নীতি গ্রহণ।
- যুদ্ধের সময় রাজপুত ও অন্যান্য হিন্দু সেনাদের সহায়তা গ্রহণ।
- ১৬৭৯ সাল থেকে ১৭০৭ সালের মধ্যে সম্রাট মোট ৯৬ জন মারাঠাকে ১০০০ জাট পদের মনসব দান করেন।

তাছাড়া, দারাশিকোর সাথে যুদ্ধকালীন সময়ে হিন্দুদের থেকে প্রাপ্ত সমর্থনের সংখ্যাগত তুলনা করলে দেখা যায়,সম্রাট ৪৫ জন হিন্দু মনসবদারের মধ্যে শীর্ষস্থানীয় ২১ জনের সমর্থন লাভ করেন। যদি তিনি কট্টর

হিন্দুদমনকারী হতেন তাহলে কি দারাশিকোর (যিনি ভ্রষ্ট ধর্মনিরপেক্ষতায় বিশ্বাসী ছিলেন) সমপরিমাণ সমর্থন, হিন্দু নেতাদের থেকে লাভ করতেন?

সম্রাটের হিন্দুদের প্রতি দয়ার নিদর্শন স্বরূপ দুটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা বর্ণনা করা যায়। একবার আওরঙ্গজেবের সেনাপতির এক ব্রাহ্মণের কন্যার রূপে মোহিত হয়ে বিয়ের প্রস্তাব দেন এবং এক মাসের মধ্যে জোর করে বিয়ে সম্পন্ন করার কথা জানান। ব্রাহ্মণ আতঙ্কিত হয়ে সম্রাট আওরঙ্গজেবের শরণাপন্ন হন। সম্রাট তাকে আশ্বস্ত করে জানান, নির্ধারিত দিনে তিনি নিজেই উপস্থিত থাকবেন। নির্ধারিত সময়ের আগেই আওরঙ্গজেব একা ব্রাহ্মণের বাড়িতে উপস্থিত হন এবং তার জীর্ণ ঘরে সারারাত ইবাদত করে কাটান। পরদিন সেনাপতি বর বেশে উপস্থিত হলে ব্রাহ্মণ সম্রাটের শেখানো মতো তাকে সেই ঘর দেখিয়ে দেন, যেখানে সম্রাট অবস্থান করছিলেন। সেনাপতি ঘরে প্রবেশ করতেই দেখতে পান সম্রাট আওরঙ্গজেব খোলা তরবারী হাতে প্রস্তুত। সাহসী সেনাপতি ভয়ে কাঁপতে থাকেন এবং অবশেষে লজ্জা ও ভয়ে অজ্ঞান হয়ে পড়ে যান। এই দৃশ্য দেখে ব্রাহ্মণ সম্রাটের পায়ে লুটিয়ে পড়েন এবং কন্যার সম্মান রক্ষার জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। সম্রাট বলেন, এটা আমার কর্তব্য। আমি দায়িত্ব পালন করতে পেরেছি, এটাই আমার আনন্দ।

আরেকবার,বেনারসের শাসনকর্তা সম্রাট আওরঙ্গজেবকে একটি গোপন পত্রে প্রস্তাব দেন যে, বেনারসের ব্রাহ্মণদের উপাসনায় হস্তক্ষেপ করা হোক, যাতে মানুষ ইসলাম ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হয়। তবে আওরঙ্গজেব এই প্রস্তাব নাকচ করে দেন।জবাবে তিনি লেখেন যে, প্রজাদের উপকার সাধন এবং সব সম্প্রদায়ের উন্নতি সাধনই তার দৃঢ় উদ্দেশ্য। তিনি নির্দেশ দেন, কোনো ব্যক্তি অন্যায়ভাবে ব্রাহ্মণদের কাজে হস্তক্ষেপ করতে পারবে না বা তাদের ওপর হামলা চালাতে পারবে না। ব্রাহ্মণরা যেন তাদের ধর্মীয় কাজে পূর্বের মতো যুক্ত থাকতে পারে এবং সাম্রাজ্যের স্থায়িত্বের জন্য সুস্থ মনে প্রার্থনা করতে পারে।

আর মন্দির ভাঙা, জিযিয়া পুনর্বহাল এবং সম্রাটের আপন ভাইয়ের সাথে যুদ্ধ করাকে যেভাবে ন্যক্কারজনক দেখানো হয়,তা সঠিক দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখলেই তার যথার্থ উত্তর পাওয়া যায়। প্রথমত, কিছু হিন্দু পণ্ডিতদের আশ্রয়ে ভারতবর্ষের কিছু মন্দিরে বিদ্রোহ, রাষ্ট্রদ্রোহ এমনকি ভুল হিন্দুত্ববাদ শিক্ষা দেওয়া শুরু হয় । তার খবর পেয়ে সম্রাট, রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব রক্ষার্থে ধর্ম প্রচারের নাম করে, বিদ্রোহ ছড়ানোর কেন্দ্রগুলোকে ধ্বংস করেন। শীর্ষস্থানীয় পণ্ডিত রিচার্ড এম. ইটনের লেখা 'মন্দির অপবিত্রকরণ এবং ইন্দো-মুসলিম রাষ্ট্র' নামক প্রবন্ধে তা সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরেছেন। তাছাড়া এখানে তিনি ভেঙে দেওয়া মন্দিরের সংখ্যা নিয়ে হিন্দুদের করা ছলচাতুরীরও রহস্যভেদ করেছেন। বলা হয়, সম্রাট হাজারখানেক মন্দির ভেঙেছেন কিন্তু এম. ইটনের মতে,এ সংখ্যা ডজনখানেকের মতো হবে। এমনকি ১৯৪৬ সালে ভারতের পঞ্চম ও ষষ্ঠ শ্রেণির পাঠ্যপুস্তক হিসেবে রচিত-হিন্দুস্থান প্রেস (১০,রমেশদত্ত স্ট্রিট কলকাতা) থেকে মুদ্রিত গ্রন্থে আছে- জোর করিয়া মন্দির ভাঙ্গিয়া মসজিদ নির্মাণের উদ্দেশ্যেই যদি আওরঙ্গজেবের থাকত,তবে ভারতে কোন হিন্দু মন্দিরের অস্তিত্বই বোধ হয় আজ দেখা যেত না । সেই করা তো দূরের কথা,বরং বেনারস,কাশ্মীর ও অন্যান্য স্থানের বহু হিন্দু মন্দির এবং তৎসংলগ্ন দেবোত্তর ও ব্রহ্মোত্তর সম্পত্তি আওরঙ্গজেব নিজের হাতে দান করে গিয়েছেন। সে সকল আজো পর্যন্ত বিদ্যমান। দ্বিতীয়ত, আকবর তাঁর আমলে জিযিয়া কর রহিত করেছিলেন,কিন্তু সম্রাট আওরঙ্গজেব তা পুনরায় চালু করেন। মূলত জিযিয়া কর টার্মটি অনেকটা আধুনিক যুগের ট্যাক্স বা খাজনার মতোই। মুসলমানরাও তা আদায় করতেন। সেটা যাকাত আদায় করে হোক অথবা উশর আদায়ের মাধ্যমেই হোক। তাছাড়া বিবিধ কারণে তখন রাষ্ট্রে অর্থনৈতিক মন্দা দেখা দেয় তা কাটিয়ে উঠতেও জিযিয়া করের প্রয়োজন ছিল। অতএব, জিযিয়া করকে ধর্মীয় বৈষম্যের দৃষ্টিতে না দেখে বরং সম্রাটের রাষ্ট্র পরিচালনার প্রজ্ঞা হিসেবেই বিবেচনা করা উচিত।

সর্বশেষে,সম্রাট আওরঙ্গজেব তাঁরই ভাই দারাশিকোর সাথে সংঘাতে লিপ্ত হয়েছিলেন বিশেষত ধর্মীয় কারণে, কেবলই সিংহাসনলাভের জন্য নয়। মূলত দারাশিকোর ব্যাপারে মুরতাদ হওয়ার বা আকবরের ভ্রান্ত 'দ্বীন-ই-ইলাহী' দ্বারা প্রভাবিত হওয়াত অভিযোগ ছিল। আর আওরঙ্গজেব ছিলেন শাইখ আহমাদ সিরহিন্দি মুজাদ্দিদে আলফে সানী (র.) এর মতাদর্শে দীক্ষিত। তাই, তিনি তার ভাইয়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ান এবং এটাও বলা হয় যে তিনি তাঁর বৃদ্ধ পিতা শাহজাহানের উপর অত্যাচার করেছিলেন। অথচ তিনি, দারা কর্তৃক প্রভাবিত পিতাকে আগ্রার লাল কেল্লায় সসম্মানে নযরদারির মধ্যে রাখেন।তাঁর পর্যবেক্ষণ এতটাই নিবিড় ছিল যে, শাহজাহান যাতে তার শ্রেষ্ঠ কীর্তি তাজমহল দেখতে পারেন তাও সম্রাট নিশ্চিত করেছিলেন।

ফিরে আসা যাক মারাঠাদের প্রসঙ্গে। শিবাজীর মৃত্যুর পর সম্ভাজী সিংহাসনে আরোহণ করেন। অতঃপর,সম্রাট আবার মুঘল-মারাঠা সম্পর্ক স্থিতিশীল করতে তৎপর হন কিন্তু এবারও তিনি ব্যর্থ হন। অতএব,সম্রাট আবারও তাঁদের দমন করতে বাধ্য হন। অথচ শিবাজীর জীবদ্দশায়,তার পুত্র সম্ভাজী ভোঁসলে ক্ষমতার লোভে পিতার বিরোধিতা করেন। তিনি মুঘল সম্রাট আওরঙ্গজেবের পক্ষের অন্যতম সেনাপতি দিলার খানের হয়ে যুদ্ধেও অংশগ্রহণ করেছিলেন। সম্রাটের পক্ষ থেকে তাকে সাত হাজার জাটের পদমর্যাদাও দান করা হয়। মুঘল-মারাঠা বিরোধ ছিলো মূলত সাম্রাজ্য বিস্তার নিয়ে, এককভাবে ধর্মীয় বিরোধ ছিল না। এটাকে ধর্ম যুদ্ধের আখ্যা দেওয়া নিতান্তই সত্যের অপলাপ। মার্কিন ইতিহাসবিদ অড্রি ট্রুশকে তাঁর "আওরঙ্গজেব-দ্যা ম্যান অ্যান্ড দ্যা মিথ" বইয়ে লিখেছেন যে, "ব্রিটিশদের শাসনের সময় তাদের 'ডিভাইড অ্যান্ড রুল' অর্থাৎ জনগোষ্ঠীকে 'বিভাজন আর শাসন করো' নীতির আওতায় ভারতে হিন্দু বর্ণবাদী ধারণা উস্কে দেওয়ার কাজটি করেছিলেন যেসব ইতিহাসবিদরা, তারাই মূলত, আওরঙ্গজেবের এমন একটি ইমেজ তৈরির জন্য দায়ী।"

ইতিহাসের ভিত্তিহীন কিছু উদ্ধৃতির ভিত্তিতে একজন মহান ব্যক্তিকে কোটি কোটি জনগণের কাছে খারাপভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে। অন্যদিকে সম্ভাজী ভোঁসলে, যাকে হিন্দুরা পূজা পর্যন্ত করেন, তার চরিত্র নিয়ে ঐতিহাসিকদের বর্ণনা আরো জঘন্য। তাঁর সমরনীতি কতটুকু বর্বর ছিল তার এমন বর্ণনা পাওয়া যায় যে, সম্ভাজী অভিযানের সময় তার নেতৃত্বে মারাঠা সৈন্যরা বেসামরিক নাগরিকদের উপর গণহত্যা এবং গণধর্ষণের মতো নৃশংসতা চালাতো। এবং জানা যায়,পরবর্তীতে যখন তিনি মুঘলদের হাতে বন্দি হন এই যুদ্ধাপরাধের কারণেই সম্রাট তাকে মৃত্যুদণ্ড দান করেছিলেন। সম্ভাজীর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে ইতিহাসবেত্তারা বলেন, একজন ব্রাহ্মণের স্ত্রীর সাথে যৌন সম্পর্ক স্থাপনের চেষ্টা করার কারণে সম্ভাজীকে পানশালায় বন্দি করা হয় এবং এই কারণে,স্বয়ং শিবাজীই তাঁকে ত্যাগ করেছিলেন।

ইতিহাস এমনই হয়। একজনের বিবরণের বিপরীতে আরেকজনের বিবরণ থাকবেই। এটাই ইতিহাসচর্চার ধর্ম। কিন্তু তাই বলে পক্ষ-বিপক্ষের শতশত ঐতিহাসিক দলীল থাকার পরেও তিন শতাব্দীর বেশি সময় আগের একটা দ্বন্দ্বের কারণে, কোন একটি নির্দিষ্ট জাতির উপর অত্যাচার-নিপীড়নের মাধ্যমে প্রতিশোধ নেওয়ার দৃষ্টান্ত বিরল। এটার পেছনে আছে ভারতবর্ষের বর্তমান রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট। ভারতের বর্তমান ক্ষমতাসীন দল বিজেপি বা ভারতীয় জনতা পার্টি হিন্দু জাতীয়তাবাদ মতাদর্শী একটি দল। ১৯৮০ সালে অটল বিহারী বাজপেয়ীর হাত ধরে এই দলের পথচলা শুরু। যদিও প্রতিষ্ঠার ২০ বছরের মাথায়ই তৎকালীন শক্তিধর দল ভারতীয় কংগ্রেসকে পরাজিত করে

বিজেপি-নেতৃত্বাধীন জাতীয় গণতান্ত্রিক জোট বা এনডিএ। কিন্তু,২০০২ সালের গুজরাটে মুসলিম গণহত্যার তীব্র প্রতিক্রিয়া স্বরূপ তার পরের নির্বাচনেই এনডিএ এর ভরাডুবি ঘটে। পরবর্তীতে ২০১৩ সালের মুজাফফরনগর দাঙ্গার বদৌলতে ২০১৪ সালে নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে দলটি আবার ক্ষমতায় আসে। তবে এবার মোদি, গুজরাট দাঙ্গার ফল দেখে তার দলের মোটিভ পাল্টান। হিন্দু জাতীয়তাবাদ ও গণতন্ত্রের ছায়ায় সংখ্যালঘু মুসলিমদের ব্লাসফেমি করা এবং মুসলিম-হিন্দু দাঙ্গা লাগিয়ে সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুদের ভোট আদায় করার পরিকল্পনা করে মাঠে নামেন। এরপর থেকে বিজেপির জনপ্রিয়তা বৃদ্ধির পদ্ধতি এমন হয়ে দাঁড়ায় যে দলটির নির্বাচনী ইশতাহারে এমন কিছু প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়, যার প্রত্যেকটাই মুসলমানদের ধর্মীয় বিশ্বাস অথবা বিস্তৃত ইতিহাসে আঘাত হানে। যার মধ্যে সিএএ আইন,এনআরসি আইন, বাবরি মসজিদের জায়গায় রামমন্দির নির্মাণ, গো রক্ষা আইন সহ কাশ্মীরের মুসলিমদের উপর সেনাবাহিনী দ্বারা নিপীড়ন অন্যতম। বিজেপির মুসলিম বিরোধী প্রোপাগাণ্ডা ছড়ানো এবং হিন্দু যুবকদের মুসলিম বিদ্বেষী ও কট্টর তৈরিতে অন্যতম হাতিয়ার হিসেবে মিডিয়া কাজ করে। যার প্রভাবে গত দশকে খোদ বিজেপি সরকারের অর্থায়নে কয়েক ডজন ইতিহাস-বিকৃত চলচ্চিত্র নির্মাণ করা হয়েছে। পরিসংখ্যান বলে, চলচ্চিত্রগুলোর মূল ভিত্তিই ছিল ইসলামের বিরোধীতা করা, প্র্যাক্টিসিং মুসলিমদের জঙ্গিবাদী আখ্যা দেওয়া এবং পাকিস্তানের ঘোর বিরোধিতা করা। এমনকি প্রায়শই প্রধানমন্ত্রী মোদিকে এসব চলচ্চিত্রের ঢালাও প্রচার করতে দেখা গেছে। যেমন, ২০২৩ সালের "দ্য কেরেলা স্টোরি" নামক চলচ্চিত্র মুসলিমদের মধ্যে বিশাল ক্ষোভের সৃষ্টি করে। কাশ্মীরের হিন্দু পণ্ডিতদের উপর নির্যাতনের ডকুমেন্টারি চলচ্চিত্র "দ্য কাশ্মীর ফাইলস" এবং অন্যান্য। সাম্প্রতিক সময়ে আগুনে ঘি ঢালা চলচ্চিত্র "ছাবা" ও এই প্রোপাগান্ডারই একটি অংশ। আশ্চর্যের ব্যাপার হলো, ইতিহাস বিকৃতির দায়ে "ছাবা" চলচ্চিত্রের বিরুদ্ধে ১০০ কোটি রুপির মানহানি মামলা পর্যন্ত দায়ের করা হয়েছিল মারাঠা সেনাপতি গানোজি ও কানোজি শির্কের বংশধরদের পক্ষ থেকে। এসব প্রোপাগান্ডামূলক চলচ্চিত্র ভারতে খুব বেশি প্রভাব ফেলে।"দ্য হিন্দু" পত্রিকার বরাতে জানা যায়, ছাবা চলচ্চিত্রে দেখানো সম্ভাজীর উপর সম্রাট আওরঙ্গজেবের বর্বরতার দৃশ্য দেখে, কেউ উত্তেজিত হয়ে সিনেমা হলের স্ক্রিন ভেঙে ফেলছেন তো কেউ কেউ সম্ভাজীর দুঃখে কাঁদতে কাঁদতে হল ছেড়েছেন। বাচ্চা থেকে শুরু করে সবার উপরেই এই চলচ্চিত্র প্রভাব ফেলেছে।

এখন সমস্যা হলো, যাদের ক্ষোভ থেকে সাধারণ বস্তু নিরাপদ নয় তাদের কাছ থেকে মুসলিমরা, যাদেরকে অন্ধভক্ত হিন্দুরা সম্রাট আওরঙ্গজেবের উত্তরাধিকারভাবে তারা কীভাবে নিরাপদে থাকবে? যা হওয়ার ছিল তাই হলো। ২০১৩ সালের মোজাফফরনগর দাঙ্গার পরিণামে, শেষ ২০১৪ সালে হিন্দুরা বয়ান তুলেছিল, যে দিল্লির আওরঙ্গজেব রোডের নাম পাল্টে অন্য কারো নামে করার। ঠিক হলোও তাই। নাম পরিবর্তন করে রাখা হলো আবুল কালাম রোড। কয়েক বছরের ব্যবধানে ২০১৭ সালে পাঠ্যবই থেকে মুঘল সাম্রাজ্যের ইতিহাসও কাটছাঁট করে একবারে নামমাত্র করে ফেলা হলো। নতুন করে সংযোজন করা হলো মারাঠা বীরদের কল্পকাহিনী। সম্প্রতি ভারতের লোকসভায় বিজেপি এমপি নরেশ মাশকে, সম্রাট আওরঙ্গজেবের কবর ভেঙে ফেলার দাবি তুলেছেন। তার মতে আওরঙ্গজেব হিন্দু ধর্ম ও জাতীয়তাবাদের শত্রু ছিলেন তাই তার কবর ভেঙে ফেলা উচিত। হয়তো অদূর ভবিষ্যতে তা বাস্তবায়ন করে ফেলাও হবে। তাছাড়া, এর প্রভাবে ভারতীয় মুসলিমদের উপর নির্যাতন বেড়েছে কয়েকগুণ। পবিত্র রামাদান মাসের সময়ে বিভিন্ন মসজিদে হামলা, তারাবীহ নামাযের সময় কয়েকশত লোক একত্রিত হয়ে "জয় শ্রীরাম" স্লোগান দেওয়া, হোলি খেলার জন্যে মসজিদে জুমুআর নামায বন্ধ করে দেওয়া, লাউড স্পিকার ব্যবহারে নিষেধাজ্ঞাসহ আরো অনেক নির্যাতন। এতসব অত্যাচারের শেষ কোথায়? ২০ কোটি মুসলমানকে বাঁচাতে আরেকজন মুহাম্মদ বিন কাসিম, সুলতান মাহমুদ কিংবা কুতুবুদ্দীনের আবির্ভাব আর কতদূর? কবে আসবে আমাদের সেই সময়? কবে হবে আমাদের গাযওয়া? প

মাদরাসা-ই দারুল মোস্তফা
MADRASAH-E-DARUL MUSTAFA
আন্তর্জাতিক মানের হিফজুল কুরআন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান

আবাসিক
অনাবাসিক
ডে-কেয়ার

নাজেরা ও নূরানী বিভাগ
হিফজুল কুরআন বিভাগ
হিফজ রিভিশন বিভাগ

ভর্তি চলছে

প্রতিষ্ঠানের বৈশিষ্ট্য
আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন অভিজ্ঞ শিক্ষকমণ্ডলী দ্বারা পরিচালিত।
তাজবিদ ভিত্তিক বিশুদ্ধ তিলাওয়াত শিক্ষা।
শিক্ষার মানোন্নয়নে অভিভাবকদের সাথে নিয়মিত বৈঠক।
নৈতিক মানোন্নয়নে নিয়মিত আখলাকী তা'লিম ও তরবিয়ত প্রদান।
পরিপাটি, পরিচ্ছন্ন ও স্বাস্থ্যসম্মত আবাসন ব্যবস্থা।
রুটিনভিত্তিক সু-শৃংখল পাঠদান ও কঠোর নিয়মানুবর্তিতা।
প্রাথমিক চিকিৎসা সেবা।

সিসি টিভির মাধ্যমে সার্বক্ষণিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা

প্রয়োজনে
হাফিজ ফয়েজ আহমদ
প্রিন্সিপাল
০১৭১৬-৮০৫৪৪৭
০১৭৯৮-৫৬১৫২১ (অফিস)

বাসা-২৬, ব্লক-ডি, রোড-১৪, শাহ্‌জালাল উপশহর, সিলেট

গণতান্ত্রিক ইসলামী রাজনীতির সমস্যা

মুহাম্মাদ হুসাইন

পৃথিবীব্যাপী ইসলামিক স্কলারদের মধ্যে যারা গণতন্ত্রকে হারাম বা কুফরী মনে করেন না, তারা সবাই এই যুক্তিই দেন যে গণতন্ত্রের ভিত্তিতে ইসলামপন্থীরা ক্ষমতা অর্জন করবে এবং পরবর্তীতে তারা ইসলামী শাসন প্রতিষ্ঠা করবে। রশিদ রিদা, আবুল আলা মওদূদী কিংবা হাসান আল বান্না থেকে ইউসুফ কারযাবী, মালিক বেননাবী থেকে হাসান তুরাবী কিংবা রশিদ ঘানুসী এরা সবাই ইসলামী শাসন প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখেছেন গণতান্ত্রিকভাবে ক্ষমতা অর্জনের মাধ্যমে। অবশ্য তাদের সবার কাছে 'গণতন্ত্র'র একহারা কোন রূপ ছিলো এমন নয়। তারা বিভিন্নজন বিভিন্নরূপ গণতন্ত্রের প্রস্তাব করেছেন। তবে সামগ্রিকভাবে এই মতবাদের প্রতি আনুগত্য অটুট রেখেই তারা ইসলামী শাসন প্রতিষ্ঠার আশা করেছেন। এর ফলাফল কী, সেটি আমরা আজকের মুসলিম বিশ্বের দিকে নযর দিলেই দেখতে পাই। গণতন্ত্রের উপর ভর করে স্পষ্ট ইসলাম বিদ্বেষ বা কুফরের বিরুদ্ধে যখন ইসলামপন্থীরা লড়াই করে, এরকম ক্ষেত্রে ইতিবাচক ফলাফল এসেছে। এর উদাহরণ তুরস্ক। কিন্তু মোটাদাগে মুসলিম জনবহুল দেশে গণতান্ত্রিক ইসলামী রাজনীতির বেলায় এটিই সত্য যে, এ ধরণের রাজনীতি দশকের পর দশক ধরে ইসলামী শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার আশ্বাস দিয়ে তা বাস্তবায়নে ব্যর্থ হয়েছে। কেবল এটুকুই নয়, বরং এ ধরনের রাজনীতির ক্ষেত্রে বেখেয়ালভাবে গণতন্ত্রের ঘেরাটোপে আটকে ইসলামের জন্য এমন কিছু ক্ষতি বয়ে আনা হয়, যেগুলো এর লাভের দিককে ম্লান করে দেয়।

গণতান্ত্রিক ইসলামী রাজনীতির ফায়দা কী? এই প্রশ্নের উত্তরে যে বিষয়টি তর্কাতীতভাবে বলা যায় তা হলো, এ ধরণের রাজনীতি ইসলাম বিরোধী চিন্তা ও মতাদর্শকে চাপের মধ্যে রাখে। তবে এটিও সত্য যে গণতন্ত্র নির্ভর ইসলামী রাজনীতিই ইসলাম বিরোধীতাকে কোনঠাসা করার একমাত্র উপায় নয়, বরং এটি আরো বহু উপায়ের একটি উপায়। কিন্তু গণতন্ত্রের কাঠামোর মধ্যে অবস্থান করেই যেহেতু এধরনের রাজনীতির চর্চা হয়, তাই সিস্টেম্যাটিকালি এটি একটি দেশে ইসলাম ও মুসলমানদের জন্য বেশ কিছু সংকট নিয়ে আসে। গণতান্ত্রিক রাজনীতিতে এক বা একাধিক প্রতিযোগী থাকে এবং বিরোধীপক্ষের বিরোধিতার ধারণাও থাকে। যারা ইসলামী রাজনীতি করেন, তারা নিজেদের সাথে ইসলামকে যে ধরণের ভাষিক-ব্যঞ্জনায় জড়ান, তাতে তারা মুখে না বললেও এটি প্রকাশ পায় যে তাদের বিরোধী পক্ষ অ-ইসলামী। এ ধরণের রাজনৈতিক কৌশলের প্রশ্রয়ে ভুল ধারণার উপর নির্ভর করে রাজনীতি সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদেরকে 'ইসলামী' ও 'অ-ইসলামী' হিসেবে বর্গভুক্ত করার সামাজিক মনোভাব তৈরি হয়। মাঠপর্যায়ে এ বিষয়টির যে প্রভাব পড়ে, সেটির রূপ অত্যন্ত বীভৎস হয়ে থাকে। যেমন রাজনীতির সাথে জড়িত কোন ইসলামী দল যেকোন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে তাদের দলীয় কাজ করতে পারবে। তাঁর হক আছে, সে ইসলামিক। কিন্তু সাধারণ রাজনৈতিক দল ঘেঁষা লোক তাবলীগ বা দাওয়াতে ইসলামির কাজের জন্যও মসজিদে আলোচনা করতে দাঁড়ালে বাঁধার মুখে পড়বে। এর কারণ ঐ ভ্রান্ত সামাজিক মনোভাব। সে ইসলামী রাজনীতির লোক নয়, বিধায় সে অ-ইসলামী। একটি মুসলিম জনবহুল দেশে এধরনের বিভাজন ইসলামী ভ্রাতৃত্ববোধকে নড়বড়ে করে দেয় এবং ইসলামকে কেন্দ্র করে একধরনের কৃত্রিম ও অনর্থক মানসিক দ্বৈরথ তৈরি করে।

আবার, ইসলামী রাজনীতির সাথে জড়িত দলগুলোর নিজস্ব মাসলাকগত ধারণা থাকে। অল্পবিস্তর পার্থক্যসহ প্রতিটি মাসলাকই ইসলামের খিদমতে নিয়োজিত থাকে। কিন্তু গণতান্ত্রিক কাঠামোতে ইসলামী রাজনৈতিক একটি দল যখন কোন মাসলাককে তার ভোটের জন্য হুমকি হিসেবে দেখে, তখন সে এই মাসলাক ও এর আওতাধীন দ্বীনি প্রতিষ্ঠানগুলোকেও হুমকি হিসেবে দেখে, বিরোধিতা করে ও বিলুপ্ত করে দিতে চায়। এতে শেষমেশ ইসলামেরই ক্ষতি হয়। গণতান্ত্রিক কাঠামোতে ইসলামী রাজনীতির এ এক ক্ষতিকর দিক। অধুনা একটি ইসলামী রাজনৈতিক দলের হস্তক্ষেপে সিলেটের কানাইঘাটে পুলিশের মাধ্যমে ইফতার মাহফিল বন্ধের চেষ্টা, বিয়ানীবাজারে কওমি উলামায়ে কিরামের সম্মেলন বন্ধ করা কিংবা এই একই দলের কর্মী-সমর্থকদের মাধ্যমে ফেঞ্চুগঞ্জে কুরআন শিক্ষার প্রতিষ্ঠান দারুল কিরাত বন্ধ করে দেওয়ার মধ্যে গণতান্ত্রিক ইসলামী রাজনীতির নেতিবাচক এই দিকটির করুণ বাস্তবতা দেখতে পাওয়া যায়। হ্যাঁ, এই ধরনের কাজ ইসলামী রাজনীতির সাথে জড়িত নয় এমন দলও করতে পারে। কিন্তু তারা এমন কিছু করলে সেটাকে 'ইসলামী' আচ্ছাদনে ঢেকে দিতে পারে না, যা ইসলামী কোনো রাজনৈতিক দল করতে পারে। এখানেই মূল পার্থক্য।

ইসলামে মুসলমানদের ভ্রাতৃত্ববোধ, একে অন্যের দোষ গোপন করে পরস্পর সংশোধনের নসীহত করা, মুসলিমদের ব্যাপারে সুধারণা পোষণ করা, একে অন্যের ছিদ্রান্বেষণ না করা ইত্যাদি যেসব মূল্যবোধ রয়েছে, সেগুলোকে অলঙ্ঘিত রেখে গণতন্ত্রের কাঠামোতে ইসলামী রাজনীতি করা অসম্ভব। কারণ বিরোধী দলের ছিদ্রান্বেষণ করে তাদের দোষত্রুটি ফাঁস করা গণতন্ত্রে খুব স্বাভাবিক রাজনৈতিক চর্চা। সুতরাং ইসলামী রাজনীতিও এই চর্চার ব্যতিক্রম কিছু করতে পারে না। ফলে এখানে ইসলামী রাজনীতি ইসলামী মূল্যবোধের ঘাতক হয়ে ওঠা অবধারিত।

গণতান্ত্রিক ইসলামী রাজনীতির একটি প্রধান বিজ্ঞাপন হলো ইসলামী হুকুমত প্রতিষ্ঠা বা শরীআহ আইন চালু করা। সাধারণ মানুষকে এই ধরনের আশ্বাস দেওয়া হলেও এটা অনেকটাই প্রতারণাধর্মী প্রতিশ্রুতি। বিদ্যমান বিশ্বব্যবস্থার অধীনস্ততা স্বীকার করে ইসলামী হুকুমত প্রতিষ্ঠা আদৌ যে সম্ভব নয়– বৈশ্বিক একাডেমায়ায় এ নিয়ে আলাপ-আলোচনা নতুন নয়। সেসব বাদ দিয়েও আমরা বাস্তবতা পর্যবেক্ষণ করলে দেখতে পাই গণতান্ত্রিক রাজনীতির মাধ্যমে পৃথিবীর কোথাও ইসলামী হুকুমত প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা সফল হয়নি। ইসলামী রাজনীতির একজন উল্লেখযোগ্য তাত্ত্বিক রশিদ ঘানুশির দল 'আন নাহদা'র নেতৃত্বাধীন জোট তিউনিসিয়ায় সরকার গঠন করেছিলো। সংসদে দলের কিছু এমপি শরীআহ আইন প্রণয়নের প্রস্তাব করলে রশিদ ঘানুসি এটি সমর্থন করেননি। রশিদ ঘানুসির বক্তব্য ছিলো– 'আন নাহদার চেয়ে তিউনিসিয়া গুরুত্বপূর্ণ'। গণতন্ত্রের মাধ্যমে ইসলামী রাজনীতি করে জনগণকে ইসলামী হুকুমতের যে স্বপ্ন দেখানো হয়, তা যে বর্তমান বিশ্বব্যবস্থা ও বৈশ্বিক রাজনীতির কারণে বাস্তবায়নযোগ্য নয়, এই ঘটনা তার জ্বলন্ত প্রমাণ।

আরেকটি বিষয় হলো গণতন্ত্রে ভোটপ্রাপ্তির জন্য চটকদার ও প্ররোচক বাগাড়ম্বরের যে প্রচলন, ইসলামী রাজনীতি এটা থেকেও আলাদা থাকতে পারে না। তারা তাদের রাজনীতিকে 'রাসূলের রাজনীতি' বা এই অর্থের এমনসব কথা বলে, যা অত্যন্ত অদূরদর্শী ও বিপজ্জনক। বিপজ্জনক এজন্য যে, ইসলামী রাজনীতি প্রচলিত রাজনীতি থেকে মৌলিকভাবে পৃথক না হওয়ায় তাদের বলা রাসূলের রাজনীতি বিদ্যমান রাষ্ট্র ও সমাজব্যবস্থায় প্রতিশ্রুত পরিবর্তন আনতে ব্যর্থ হতে বাধ্য। এতে করে তাদের দেখানো ভুল স্বপ্নে বিভোর হওয়া জনতার সহসা স্বপ্নভঙ্গের ঘটনা ঘটবে, যেরকমটা গত শতকে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার ক্ষেত্রেও ঘটেছিলো।

ইসলামে রাজনীতির একান্ত নিজস্ব ও স্বকীয় ধারণা হলো খিলাফত-ইমারত। তবে এটি ক্ষমতাকেন্দ্রে পদরেখা অঙ্কনে স্বপ্নাতুর অর্বাচীনদের উপস্থাপিত 'খণ্ডিত' খিলাফত থেকে আলাদা; একটি স্বতন্ত্র বিশ্বব্যবস্থা। সমাজ ও রাষ্ট্রে সামগ্রিক দাওয়াতের মাধ্যমে খিলাফত-ইমারত ধারণাকে জনপরিসরে পরিচিত করে তোলা এবং এ ব্যাপারে জনসমর্থন সৃষ্টি করার মাধ্যমে ইসলামী মৌলিক রাজনীতির দিকে অগ্রসর হওয়া সম্ভব। প্রচলিত গণতান্ত্রিক ইসলামী রাজনীতিকে 'ইসলামের রাজনীতি' নয়, বড়জোর একটি সাময়িক সার্ভাইভাল স্টেপ হিসেবে দেখা যেতে পারে। কিন্তু ইসলামের মৌলিক ও প্রকৃত রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে আড়াল করে ইসলামের মোড়কে প্রচলিত রাজনীতি করে এটাকেই আবার 'ইসলাম' হিসেবে চিত্রায়ণ সন্দেহাতীতভাবে প্রতারণা। এ ধরণের রাজনৈতিকতার অপরিশীলিত চর্চা অল্প লাভের বিপরীতে ইসলামী রূহানিয়্যাত, দ্বীনি মূল্যবোধ এবং মুসলিম জনবহুল দেশের ইসলাম কেন্দ্রিক জাতিগত অখণ্ডতার জন্য অভিশাপ বয়ে আনে।

কবি মাওলানা রূহুল আমীন খান-এর
সাক্ষাৎকার

[সাহিত্যিক, সাংবাদিক, কলামিস্ট, কবি-গীতিকার, ইসলামী চিন্তাবিদ, সংগঠক ইত্যাদি নানা পরিচয়ে স্বনামখ্যাত ব্যক্তিত্ব মাওলানা রূহুল আমীন খান। সমসাময়িক জাতীয় ঘটনাপ্রবাহ ও মুসলিম বিশ্ব নিয়ে গভীরাশ্রয়ী কলাম রচনায় তাঁর অবস্থান অনন্য। সাংবাদিকতায় তিনি ছিলেন দৈনিক ইনকিলাবের নির্বাহী সম্পাদক। সংগঠক হিসেবে তিনি বাংলাদেশ জমিয়তুল মোদাররেছীনের যুগ্ম মহাসচিবের দায়িত্ব পালন করেছেন।তিনি বাংলাদেশের তরীকতপন্থি দরবারসমূহের সম্মিলিত প্লাটফর্ম বালাকোট চেতনা উজ্জীবন পরিষদের আহ্বায়ক । আরবী, ফারসি গ্রন্থ অনুবাদে তিনি অনন্য প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছেন। কাসিদায়ে বুরদা, কাসিদায়ে শাহ নিয়ামতুল্লাহ, কালামে ইকবাল, কাসিদায়ে বানাত সোয়াদ, দিওয়ানি ওয়ায়েসি, নালায়ে কলন্দর ইত্যাদি কালজয়ী কাব্যের অনুবাদ করেছেন।লিখেছেন ইসলামী সংগীত গ্রন্থ শারাবান তাহুরা। ইসলামিক ফাউন্ডেশন থেকে প্রকাশিত মসনবী শরীফের কাব্যানুবাদ তাঁর অন্যতম শ্রেষ্ট সৃষ্টি । স্কুল ও মাদরাসার টেক্সটবুক হিসেবে আকাইদ ও ইসলামিয়াতের বহু পাঠ্যবেই রচনা করেছেন। এছাড়াও ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রকাশিত বুখারী শরীফ, মুসলিম শরীফ, ফাতওয়া ও মাসাইল ইত্যাদি অনুবাদ গ্রন্থের সম্পাদনা করেছেন। সাংবাদিকতার সুবাদে মুসলিম বিশ্বের দেশগুলো ভ্রমণ করেছেন, বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সম্মেলনে যোগদান করে বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব করেছেন। পথিতযশা এই আলিম ও সাহিত্যক মনীষার সাক্ষাৎকার নিয়েছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক মাওলানা আহমদ হাসান চৌধুরী ফুলতলী। মাসিক পরওয়ানার পাঠকদের জন্য ধরাবাহিকভাবে তুলে ধরা হলো।]

আহমদ হাসান চৌধুরী: আপনার ছাত্রজীবন সম্পর্কে কিছু বলুন?

রূহুল আমীন খান: প্রাইমারি শিক্ষা: প্রথম শ্রেণি থেকে ৪র্থ শ্রেণি পর্যন্ত পড়ালেখা করেছি আমাদের বাড়িতে অবস্থিত সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে। তার পার্শ্বেই ছিল মাদরাসা। সেখানে ভর্তি হই দাখিল আউয়ালে (সে সময়ে একে বলা হতো দাহম) দাখিলের ৪র্থ শ্রেণিতে (জামাআতে হাফতমে) ছিল কেন্দ্রীয় পরীক্ষা। এ পরীক্ষায় পাশ করে বাড়ির মাদরাসাতেই পড়ালেখা করি জামাআতে ছুওম পর্যন্ত। (যা এখন আলিমে দুওম) এই শ্রেণিতে পরীক্ষায় পাশ করে ছারছীনা দারুচ্ছুন্নাত আলীয়া মাদরাসায় ভর্তি হয়ে সেখান থেকে ফাযিল ও কামিলে পড়াশুনা করি (দুওম উলা ও টাইটেল) এবং সেখান থেকে কেন্দ্রীয় পরীক্ষায় পাশ করে আই.এ. ইন্টারমিডিয়েট (তখন ফাযিল পাশ করে সরাসরি বি.এ তে ভর্তি হওয়া যেত না) ভর্তি হই শেরে বাংলা ফজলুল হক প্রতিষ্ঠিত ঢাকা কলেজে। সেখান থেকে আই.এ. পাশ করে ঢাকায় চলে আসি এবং তৎকালীন কায়েদে আযম কলেজে বর্তমানে সোহরাওয়ার্দী কলেজের নাইট সেকশনে বি.এ.তে পড়াশোনা করি এবং দিনের বেলায় ছারছীনার পীর ছাহেব হুযুর প্রতিষ্ঠিত 'সাপ্তাহিক ইশায়া' পত্রিকার সম্পাদনা তথা পরিচালনা করতে থাকি। এ পত্রিকার সম্পাদক হিসেবে হযরত মাওলানা আযীযুর রহমান (কায়েদ ছাহেব হুযুর) এর নাম থাকলেও সমূদয় কাজের ভার ছিল আমারই উপরে।

ছাত্রজীবনে পাঠ্যপুস্তক তথা নিসাবের বই কিতাব পড়েছি যতটা সম্ভব। কিন্তু বেশি মনোযোগ ছিল কবিতা, সাহিত্যের বই-পুস্তক পড়া ও বিভিন্ন পত্রিকার কিশোরদের পাতায় লেখলেখি করা। ছারছীনা থেকে প্রকাশিত পাক্ষিক তাবলীগ তো ছিলই। ছিল দৈনিক আযাদের মুকুল মাহফিল। পূর্বদেশের চাঁদের হাট ও মাওলানা মুহিউদ্দিন খানের মাসিক মদীনায় লেখালেখি করা। আমাদের সময়ে ক্লাসে তাকরার হতো নিয়মিত। তাকরার হলো উস্তাদগণ ক্লাস রুম থেকে চলে যাওয়ার পর ঐ সবক নিয়ে নিজেদের মধ্যে পরস্পরে আলাপ-আলোচনা করা। এতে পড়া ও বুঝার কাজটা ক্লাসরুমে বসেই মোটামুটি হয়ে যেত। আমি বাকি সময়টার বেশি অংশ সাহিত্যচর্চায় মনোনিবেশ করতাম।

আহমদ হাসান চৌধুরী: তৎকালীন শিক্ষার পরিবেশ সম্পর্কে কিছু বলুন?

রূহুল আমীন খান: পরিবেশ ও পারিপার্শ্বিকতা সবসময় পরিবর্তনশীল। আমাদের পূর্বে উস্তাযকেন্দ্রিক শিক্ষার যে পরিবেশ ছিল আমাদের সময়ে হুবহু তা ছিল না। আবার আমরা যে পরিবেশ পেয়েছিলাম তা এখন দেখতে পাই না। তখনকার উস্তায শাগরিদের মধ্যে যে সম্পর্কের কথা শুনি আমাদের সময়ে হুবহু তা বিদ্যমান ছিল না। আবার আমাদের সময়ে যেরূপ সম্পর্ক ছিল এখন সেরূপ দেখতে পাচ্ছি না। তবু আমাদের সময়ে উস্তাযদের আমরা দারুণভাবে ভয় করতাম, সেই সাথে খুব শ্রদ্ধা ও মুহাব্বাতও করতাম। তাঁরাও যেমন শাসন করতেন তেমনি নিজ সন্তানের মতো স্নেহও করতেন। ক্লাসের বাইরেও আমাদের কাছে এসে পড়া বুঝিয়ে দিতেন। সুখ-দুঃখের অংশভাগী হতেন।

আমি ছারছীনা দারুচ্ছুন্নাত আলিয়া মাদরাসায় ফাযিল, কামিল পড়েছি। তখন সেখানকার নিয়ম-কানুন ছিল অত্যন্ত কঠোর। দাড়ি, টুপি, নিসফে সাক জুব্বা পরিধান করা ছিল বাধ্যতামূলক। পাঁচ ওয়াক্ত নামাযে বিশেষ করে ফজর ও ইশার নামাযের পরপরই খাতা নিয়ে হাযিরা নেওয়া হতো। এতে কেউ গায়র হাযির (অনুপস্থিত) থাকলে শাস্তি দেওয়া হতো। মফস্বল এলাকার মাদরাসাগুলোতে তো তেমন আবাসিক ব্যবস্থা ছিল না। ছিল লজিং এর ব্যবস্থা। সেখানেও লজিং

মাস্টারের নিকট হুজুররা জিজ্ঞাসা করতেন, ছাত্রটির চাল-চলন ও নামাযে পাবন্দি ইত্যাদির খবরাখবর। এখনকার মতো তখন বেতন স্কেল, সরকারি সুযোগ-সুবিধা ইত্যাদি কিছুই ছিল না। মাদরাসা কর্তৃপক্ষ মাদরাসার শিক্ষকগণ গ্রামের বাড়ি বাড়ি গিয়ে মৌসুমী চাঁদা তুলতেন। তা দ্বারাই শিক্ষকগণের বেতন ও মাদরাসার অন্যান্য ব্যয় নির্বাহ করা হতো। ছাত্রদের নিকট থেকেও সামান্য বেতন নেওয়া হতো। এভাবে এলাকার লোকদের সাথে মাদরাসার একটা গভীর সম্পর্ক গড়ে উঠতো। এখন তেমনটা দেখা যায় না। আর ছাত্রদের মধ্যকার সম্পর্ক ছিল সহোদর ভাইয়ের মতো। ছাত্রজীবন শেষেও অনেক ক্ষেত্রে তা বিদ্যমান থাকতো। উপর জামাআতের ছাত্ররা ছিল বড় ভাই, নিচের জামাআতের ছাত্ররা ছিল ছোট ভাই। একটা হৃদ্যতাপূর্ণ পরিবেশ ছিল সর্বক্ষেত্রে।

আহমদ হাসান চৌধুরী: কোন কোন শিক্ষকদের দ্বারা আপনি বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়েছেন?

রূহুল আমীন খান: আমার সবসময় মনে হতো, উস্তাযগণ অন্যান্যদের তুলনায় আমাকে অধিক স্নেহ করেন। এই বার্ধক্যেও অনেক উস্তাযের কথা আমার মনে পড়ে। যেমন মনে পড়ে আমার মরহুম আব্বাকে। উস্তাযদের সংখ্যা তো অনেক। তাঁদের মধ্যে আমার বাড়ির মাদরাসার শিক্ষক মাওলানা ফদলুর রহমান (র.), মাওলানা আবদুর রাযযাক (র.), মাওলানা হামীদুল্লাহ ফাযিলে দারুল উলূম দেওবন্দ (র.) এবং ছারছীনা দারুচ্ছুন্নাত আলিয়া মাদরাসার মাওলানা আযীযুর রহমান নেছারাবাদী (ভাইস প্রিন্সিপাল), মাওলানা নিয়াজ মাখদুম তুর্কিস্তানী খাতানী হুযুর (হেড মুহাদ্দিস), মাওলানা আবদুস সাত্তার (সেকেন্ড মুহাদ্দিস) বিহারী হুযুর, মাওলানা আব্দুল কুদ্দুস হেড মাওলানা হুযুর, মাওলানা আহমাদুল্লাহ, মাওলানা হেমায়েত উদ্দীন (র.), প্রমুখের কথা হামেশা মনে পড়ে।

মাওলানা নিয়ায মাখদুম তুর্কিস্তানী ছিলেন ছারছীনা দারুচ্ছুন্নাত আলিয়া মাদরাসার হেড মুহাদ্দিস। তিনি ছিলেন চীন দেশের উইঘুর এলাকাস্থ খাতানের বাসিন্দা এবং সেখানকার মুসলিম শাসকের একজন সামরিক অফিসার। এসময় সেখানে কমিউনিস্ট আন্দোলন জোরে-শোরে চলছিল, চলছিল কমিউনিস্ট বিপ্লবীদের সাথে মুসলিম সেনাদের লড়াই। এই লড়াইয়ে সম্মুখ সমরে খাতানী হুযুরের বাহিনী পরাজিত হয়। তিনি পালিয়ে আসেন তার মধ্য থেকে। তাঁর পেছনে ধাওয়া করতে থাকে বিপ্লবী সেনারা। তিনি সম্মুখে দেখতে পান জিনপোষ লাগানো একটি ঘোড়া। এই ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে ভাগতে থাকেন। সম্মুখে পড়ে একটি নদী। তিনি ঘোড়ার পিঠে থেকে ঝাঁপিয়ে পড়েন নদী বক্ষে। নদী পার হতেই মারা যায় ঘোড়াটি। পায়ে হেঁটে আফগানিস্তান হয়ে প্রবেশ করেন ভারতে। পৌঁছেন দারুল উলূম দেওবন্দে এবং সেখানে পড়ালেখা আরম্ভ করেন। সর্বশেষ পরীক্ষায় তিনি প্রথম স্থান অধিকার করেন। ওদিকে উইঘুরের পড়ে থাকে তাঁর সহধর্মিনী ও সদ্যজাত পুত্র। যার মুখ দেখার সুযোগও তিনি পাননি। সে যা হোক। এদিকে বাংলাদেশের ছারছীনায় তখন কামিল টাইটেল খোলা হয়। মুহাদ্দিসের জন্য চিঠি পাঠানো হয় দারুল উলূম দেওবন্দ মাদরাসায়। তাঁরা সেখান থেকে তাঁকে পাঠিয়ে দেন ছারছীনায়। শুরু হয় দারস-তাদরীসের আরো এক জীবন। ইন্তিকালের পূর্ব পর্যন্ত এ খিদমাতই তিনি জারী রাখেন। তাঁর মাযার ঢাকার আজিমপুর গোরস্তানে। তিনি ছিলেন বাহ্রুল উলুম। 'ইন্নামাল আমালু বিন নিয়্যাত' হাদীসটি নিয়ে একমাস ধরে আলোচনার পর তিনি বললেন, সামনে চলো ভাই 'এয় সা আগার চলতে রাহে তো নেসাব খতম নেহি হোগী'। তিনি জ্যোতির্বিদ্যাও শিখেছিলেন। গ্রহ নক্ষত্র পর্যবেক্ষণের যন্ত্রবিশেষ 'উসতুল্লাব' তিনি নিজ হাতে তৈরি করেছিলেন।

মাওলানা আযীযুর রহমান নেছারাবাদী ছিলেন আমার আরো এক অতি প্রিয় উস্তায। তাঁর কাছে আমি হিদায়া, শিকওয়া ও জওয়াবে শিকওয়া পড়েছি। সাংগঠনিক কাজ ও সাংবাদিকতায় তাঁর আগ্রহ ছিল প্রচুর। জমিয়াতে হিযবুল্লাহ সংগঠনের তিনি ছিলেন 'নাযিমে আলা'। আর 'পাক্ষিক তাবলীগ' ও 'সাপ্তাহিক ইশায়াতের' তিনি ছিলেন সম্পাদক, আমি ছিলাম নির্বাহী সম্পাদক। তিনি মাঝে মাঝে বলতেন রূহুল আমীন হচ্ছে 'আমার মানসপুত্র'। তিনি ছারছীনায় প্রথম আমার সংবর্ধনার আয়োজন করেন।

আমার প্রিয় ও মশহুর উস্তায অনেক। তাঁরা স্ব স্ব ক্ষেত্রে বেশ প্রসিদ্ধ। তাঁদের কথা লিখতে গেলে বিরাট গ্রন্থ হয়ে যাবে তাই এ প্রসঙ্গের এখানেই সমাপ্তি টানছি।

আহমদ হাসান চৌধুরী: আপনার শিক্ষকতা জীবনের অভিজ্ঞতা সম্পর্কে আমাদেরকে কিছু বলুন? প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষকতা থেকে অব্যাহতি নেওয়ার কি বিশেষ কোনো কারণ রয়েছে?

রূহুল আমীন খান: আসলে শিক্ষকতা দিয়ে আমার কর্মজীবন শুরু হয়নি, হয়েছে সাংবাদিকতা দিয়ে। কায়েদে আযম কলেজে বর্তমানে সোহরাওয়ার্দি কলেজে তখন আমি অধ্যয়নরত ছিলাম। এসময় ছারছীনার পীর ছাহেব ও জমিয়াতুল মোদার্রেছীনের সভাপতি মাওলানা এম এ মান্নানের উদ্যোগে ঢাকার ৫৬/এ প্যারিদাস রোড থেকে প্রকাশিত হয় 'সাপ্তাহিক ইশায়াত'। এর নির্বাহী সম্পাদক হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয় আমাকে। অবশ্য পত্রিকাটির সার্বিক দায়িত্ব ন্যস্ত করা আমার উপর। আমি মন-প্রাণ ঢেলে পত্রিকাটি বের করতে থাকি। পত্রিকা পরিচালনায় মাওলানা মুহিউদ্দিন খান (র.) আমাকে আন্তরিক সহযোগিতা করতেন। এসময় শুরু হয় স্বাধীনতা যুদ্ধের চূড়ান্ত পর্যায়। সব কাজ বন্ধ করে আমি চলে যাই আমার গ্রামের বাড়িতে। নয় মাস যুদ্ধের পর ১৬ ডিসেম্বর আসে মহান বিজয়।

এর মাস তিনেক পরে আমি ঢাকায় ফিরি। সাপ্তাহিক ইশায়াতের প্রকাশ ডিসেম্বরেই বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। তা আর প্রকাশিত হয়নি। এসময় ঢাকার রেঙ্কিন স্ট্রিট থেকে দৈনিক গণকণ্ঠ বের হয়। রাজনীতির রহস্য পুরুষ হিসেবে খ্যাত জনাব সিরাজুল আলম খান দাদা ভাই এর তত্ত্বাবধানে পূর্ব পরিচিতির সুবাদে আমি গণকণ্ঠে যোগদান করি। ছারছীনা মাদরাসা তখন প্রায় বন্ধ। পীর ছাহেব হুযুর অন্তরীন। তাঁর মেঝভাই মেঝ পীর ছাহেব মাওলানা শাহ মো: সিদ্দীক (র.) এ সময় ঢাকা এলেন। বন্ধপ্রায় মাদরাসা পরিচালনার দায়িত্ব তাঁর কাঁধে নিয়ে তিনি মাদরাসার খিদমাতের জন্য আমাকে ছারছীনা চলে আসার প্রস্তাব দেন। তাঁর প্রস্তাব গ্রহণ করে সপরিবারে ছারছীনা চলে এসে মাদরাসায় শিক্ষক হিসেবে যোগদান করি। অংশগ্রহণ করি প্রতিষ্ঠানের অন্যান্য খিদমাতেও।

১৯৮২ সালে ইরাকের প্রেসিডেন্ট সাদ্দাম হোসেন ইরাকের রাজধানী বাগদাদে আহ্বান করেন এক আন্তর্জাতিক ইসলামী কনফারেন্স। এই কনফারেন্সে বিশ্বের ৮২টি দেশের প্রতিনিধিদের দাওয়াত জানানো হয় যোগদানের জন্য। জমিয়াতুল মোদার্রেসীনের সভাপতি মাওলানা এম এ মান্নানের ইরাকের সাথে নিবিড় সম্পর্ক ছিল আগে থেকেই। তাঁর মাধ্যমে বাংলাদেশের উলামা-মাশাইখদের একটি প্রতিনিধি দলকে দাওয়াত জানানো হয় এই আন্তর্জাতিক ইসলামী কনফারেন্সে। যথাসময়ে বাংলাদেশী প্রতিনিধি দল যোগদান করেন এই ইসলামী কনফারেন্সে। যার মধ্যে ছারছীনার পীর ছাহেব হযরত মাওলানা শাহ

আবু জাফর মো: ছালেহ (র.) সহ আরো অনেকে ছিলেন। ছিলাম আমিও। সেখানে বসে পীর ছাহেব হুযুর মাওলানা এম এ মান্নান (র.) এর নিকট প্রস্তাব দেন একটি দৈনিক পত্রিকা প্রকাশের। তিনি এ প্রস্তাব গ্রহণ করেন এবং দেশে প্রত্যাবর্তন করে ছারছীনা গিয়ে পীর ছাহেব হুযুরের নিকট প্রস্তাব দেন মাদরাসার শিক্ষকতা থেকে অব্যাহতি দিয়ে পত্রিকা প্রকাশের কাজ আনজাম দেওয়ার জন্য আমাকে ঢাকা নিয়ে যাওয়ার। অগত্যা হুযুর কিবলাহ এতে রাজি হন এবং আমি সপরিবারে ঢাকা এসে 'ইনকিলাব' প্রকাশের প্রাথমিক কাজ শুরু করি। ১৯৮৬ সালে 'ইনকিলাব' আত্মপ্রকাশ করে মাওলানা হুযুরের সুযোগ্য জ্যৈষ্ঠপুত্র এ এম এম বাহাউদ্দীনকে করা হয় এর সম্পাদক এবং আমার উপর দায়িত্ব অর্পণ করা হয় এর নির্বাহী সম্পাদকের।

আহমদ হাসান চৌধুরী: আপনার কবিতা লেখার সূচনা কীভাবে হয়েছিল?

রূহুল আমীন খান: আপনার প্রথম প্রশ্নের উত্তরে আমি বলেছি নিতান্ত শৈশবে মায়ের কোলের কাছে বসে তার মুখে কীভাবে (পদ্যে রচিত) পুথি সাহিত্য এবং তার ছন্দ কীভাবে শুনে শুনে বেড়ে উঠেছি। সেই থেকে আমার মনে অনুরণিত হয়েছে সুর ও ছন্দ। যখন লিখা লিখতে শিখলাম তখন কবিতা আকারে যা মনে আসতো তার কিছু কিছু স্কুলের খাতায় লিখে রাখতাম। অবশ্য সেসব সংগ্রহ করে রাখা হয়নি। আমার একটি স্বভাবগত ব্যাধি আছে। মনে আসলে কিছু লিখি কিন্তু তা সযত্নে সংরক্ষণ করি না। ক্রমে তা হারিয়ে যায়।

আহমদ হাসান চৌধুরী: আপনার প্রথম কবিতা কোনটি?

রূহুল আমীন খান: একেবারে সুনিশ্চিতভাবে বলতে পারবো না। তবে যদ্দুর মনে পড়ে, মুনাজাত শীর্ষক কবিতাটিই আমার প্রথম কবিতা, যা পাক্ষিক তাবলীগ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। কবিতাটি নিম্নরূপ–

আমি যদি চলি সরল পথে থাকিয়া ধরার মাঝে
তব খোশশুদী করি যদি আমি কামনা সকল কাজে
রাসূল যাহা বাতিয়ে গেছেন করি যদি আমি তাহা
যে রাহে চলিয়া পেয়েছে তোমায় ধরি যদি সেই রাহা
স্বদেশের হিতে থাকি যদি আমি চেষ্টিত অবিরত
স্বজাতির তরে জীবন আমার করি যদি আমি গত
তাহলেই প্রভু এই ধরাধামে
জীবিত রাখিও মোরে।
আর যদি হই কুপথে চালিত থেকে এই ধরাধামে
যে কাজে তুমি হওগো বেজার করিলে তা ছুবেহ শামে
রাসূল যাহা নিষেধ করেছে করি যদি আমি তাহা
যে রাহে তোমার চির অভিশাপ ধরি যদি সেই রাহা
আমা দ্বারা যদি হয় প্রভু কভু স্বদেশের কোনো ক্ষতি
মম কাজ দ্বারা হয় যদি বিভু স্বজাতির অবনতি
তাহলে যেন আজই সবাই
আমার কবর খোঁড়ে।

আহমদ হাসান চৌধুরী: আপনার প্রথম বই কোনটি?
রূহুল আমীন খান: হিযবুল্লার ডাক।

আহমদ হাসান চৌধুরী: আপনার কতটি বই প্রকাশিত হয়েছে?
রূহুল আমীন খান: চৌদ্দটি। তবে আমি– অন্যদের সাথে মিলে সিহাহ সিত্তাহ, তাজরীদুস সিহাহ (হাদীস), তাফসীরে ইবনে আব্বাস (তাফসীর), ফাতওয়া ও মাসাইল ফিকহসহ ইসলামী ফাউন্ডেশনের ৫০টির মতো গ্রন্থ সম্পাদনা করেছি।

আহমদ হাসান চৌধুরী: আপনার অপ্রকাশিত বই আছে কি না?
রূহুল আমীন খান: হ্যাঁ, কয়েকটি অপ্রকাশিত পাণ্ডুলিপি আছে।

আহমদ হাসান চৌধুরী: বাংলাদেশের ইসলামী সাহিত্য অঙ্গনের বর্তমান পরিস্থিতি কীভাবে মূল্যায়ন করবেন?

রূহুল আমীন খান: আল্লাহর মেহেরবানি, দেশে এখন ইসলামী সাহিত্য-চর্চা অনেক বেড়েছে। বিখ্যাত মাদরাসাগুলো থেকে বের হয় বার্ষিক ম্যাগাজিন। তাতে ছাত্র শিক্ষক ও সাহিত্যানুরাগীরা লেখালেখি করেন। এছাড়া স্বউদ্যোগেও কিছু মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হচ্ছে। চর্চা বেড়েছে সত্য কিন্তু গুণ ও মানের উৎকর্ষ আশানুরূপ পরিলক্ষিত হচ্ছে না। এদিকে মনোযোগ দেওয়া প্রয়োজন বলে মনে করি।

আহমদ হাসান চৌধুরী: বাংলাদেশে ইসলামী সাহিত্যের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আপনার অভিমত জানতে চাই।

রূহুল আমীন খান: ইসলামী সাহিত্যচর্চা একশ্রেণির মধ্যে বৃদ্ধি পাচ্ছে সন্দেহ নেই। কিন্তু প্রতিভাবান লেখকগণ ইসলাম নিয়ে, ইসলামের সৌন্দর্য্য ও বিশ্বজনীন অবদান ও আবেদন নিয়ে লেখালেখি করছেন না বললে অত্যুক্তি হবে না। তাঁরা ধর্ম তথা ইসলামের বিরুদ্ধে লেখাকেই মনে করেন আধুনিকতা। এই তথাকথিত আধুনিক লেখকদের মুকাবিলায় ইসলামী লেখকদের কলমকে আরো শাণিত করতে হবে। লেখাকে বিশ্বমানের করে তোলার জন্য সাধনা আরো বৃদ্ধি করতে হবে। কলম যুদ্ধে বিজয়ী হতে হবে। এই বিজয় অর্জনের জন্য চাই মেধা ও মননের শক্তি। ইসলামী লেখকদের সে শক্তি প্রদর্শন করতে হবে।

কথাটা আরো একটু খোলাসা করে বলি। আমার মতে উর্দূ ভাষায় যেমন বিশাল ইসলামী সাহিত্য গড়ে উঠেছে বাংলা ভাষায় তেমনটা গড়ে ওঠেনি। আমাদের ছাত্রজীবনে আরবী ব্যাকরণ পড়েছি ফার্সী ভাষায়, উস্তাযগণ বুঝিয়েছেন সেটা উর্দু ভাষায়, আমরা ছাত্রগণ তার মর্ম বুঝেছি মাতৃভাষা বাংলাতে। উর্দূ ভাষাভাষী আলিমগণ ঐ ভাষায় বিশাল ইসলামী সাহিত্য গড়ে তুলেছেন সেই তুলনায় আমাদের বাংলা ভাষাভাষী আলিমগণ অনেক পিছিয়ে। অন্যদিকে পূর্বকার কবি-সাহিত্যিকগণ যেমন ইসমাঈল হোসেন সিরাজী, কবি নজরুল ইসলাম, গোলাম মোস্তফা, ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ, আকরাম খাঁ, নজীবুর রহমান, ইয়াকুব আলী চৌধুরী, তাঁদের সাহিত্যে যেমন ইসলাম প্রসঙ্গ নিয়ে এসেছেন হালের কবি সাহিত্যিকগণ তেমনটা তো আনছেনই না বরং আনছেন যেন একে ব্যঙ্গ বিদ্রুপ করার দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে। তাঁদের এ মানসিকতার পরিবর্তন আনাতো হালের ইসলামী লেখকদের পক্ষে সম্ভব নয় বরং তারচেয়েও শক্তিশালী ও সৃজনশীল লিখনী দিয়েই এর মুকাবিলা করা আবশ্যক বলে আমি মনে করি। কালচারাল ভিক্টরি পলিটিক্যাল ভিক্টরির চেয়ে কম গুরুত্বপূর্ণ নয়।

আহমদ হাসান চৌধুরী: বাংলাদেশে ইসলামী সাহিত্য অঙ্গনের লেখকরা আর্থিক দিক থেকে যথাযথ মূল্যায়ন পান না বলে অভিযোগ রয়েছে। এ বিষয়ে আপনার অভিজ্ঞতা কেমন?

রূহুল আমীন খান: কথা অসত্য নয়। এজন্য লেখার মান বাড়িয়ে পাঠক চাহিদা বৃদ্ধি করতে হবে। একজন ওয়াইযকে দুই এক ঘণ্টা ওয়াজের জন্য কত হাদিয়া দেওয়া হয়? অথচ একজন লেখককে একটি মানসম্মত লেখা তৈরি করার জন্য পরিশ্রম করতে হয় তারচেয়ে অনেক বেশি সময় ধরে। কিন্তু তাকে সম্মানি দেওয়া হয় কত? এটা প্রকাশকদের বিবেচনা করা উচিত নয় কি?

আহমদ হাসান চৌধুরী: কবিতার ক্ষেত্রে আপনি কি কাউকে অনুসরণ করেন?

রূহুল আমীন খান: 'আর্ট ফর আর্ট' আমার নীতি নয়। আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের আকীদায় দৃঢ়ভাবে স্থিত থাকা এবং সালফে সালিহীনের পথ ধরে চলাকে আমি জরুরি মনে করি। এই মতাদর্শের কবি সাহিত্যিকদের লেখা থেকে আমি প্রেরণা পাই। এদের মধ্যে বাংলা, উর্দূ, ফার্সী, আরবী ভাষার কবি সাহিত্যিকগণ রয়েছেন। আমি নির্দিষ্ট কাউকে অনুসরণ করি না। আমি লিখি আমার নিজস্ব স্টাইলে। তবে একই পন্থীদের বক্তব্যে কখনো কখনো মিল হয়ে যাওয়া অসম্ভব নয়।

আহমদ হাসান চৌধুরী: লেখালেখির ব্যাপারে আপনার বিশেষ কোনো স্মৃতি যদি থাকে...?

রূহুল আমীন খান: ২৯শে জুলাই ১৯৭৭ সালের কথা। আমি তখন ছারছীনা দারুচ্ছুন্নাত আলিয়া মাদরাসায় শিক্ষকতা করি। আমার পরম শ্রদ্ধেয় উস্তায হযরত মাওলানা আযীযুর রহমান নেছারাবাদী কবি হিসেবে ছারছীনায় আমাকে সংবর্ধনা দেওয়ার একটি আয়োজন করেন। মাদরাসার ছাত্র-শিক্ষক বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনার সাথে এ সভায় যোগ দেন। ছাত্ররা মিছিল করে নানা শ্লোগান দিয়ে আমার বাসা থেকে আমাকে সভাস্থলে নিয়ে আসে। সভায় আমার উস্তাযগণ যারা তখন ছারছীনায় শিক্ষকতা করছিলেন তাঁরা সকলে যোগদান করেন। যোগদান করে সকল ছাত্র এবং স্থানীয় সাহিত্যানুরাগীদের অনেকে। বক্তৃতা করেন তাদের কয়েকজন। একটি সংবর্ধনাপত্র পাঠ করা হয়। আমার বক্তব্য পেশ করার পর শুরু হয় উপহার দেওয়ার পালা। উপর জামাআতের ছাত্ররা তো বটেই, নিচের জামাআতের শিশু কিশোররাও তাদের সংগ্রহে থাকা বই এনে দিতে থাকে। পুস্তকের স্তুপ জমে যায়। তাদের আন্তরিক ভালোবাসায় আমি আপ্লুত হই। নিজের অজান্তেই আমার চোখ থেকে অশ্রু গড়িয়ে পড়তে থাকে। পরবর্তীকালে দেশে ও বিদেশে বেশ কিছু সংবর্ধনা পেয়েছি কিন্তু সেদিনের মতো আবেগ উচ্ছ্বাস ও ঐকান্তিকতা আর দেখিনি।

আরো একটি ঘটনা বেশ কৌতুহলের। আমি তখন লন্ডন সফরে। বন্ধুজনরা একটি টেলিভিশনের বাংলা প্রোগ্রামে আমার অংশগ্রহণের ব্যবস্থা করলেন। সময়মতো উপস্থিত হলাম স্টুডিও রুমে। দেখলাম কয়েকজন টিভি কর্মী গভীর মনোযোগ সহকারে একটি নাতে রাসূল (সা.) শুনছেন। তাঁরা হাতের ইশারায় আমাদেরকে বসতে বললেন এবং চুপ থাকতে বললেন। তাঁদের শোনা শেষ হলে জিজ্ঞাসা করলেন, কেমন? ভালো না? বললাম, হ্যাঁ। বললেন, আগে শুনেছেন কখনো? বললাম, হ্যাঁ, শুনেছি। বললেন, চেনেন এর লেখক কে? আমি জবাব দিবার আগেই আমার সাথি বললেন, ইনিই তো এই নাতের লেখক। তখন তাঁরা একে একে আমার সাথে বুকে বুক মেলাতে লাগলেন নাতটি ছিল- 'শামসুদ্দোহা আসসালাম/বদরুদ্দোজা আসসালাম/নূরুল হুদা আসসালাম, আসসালাম...

আহমদ হাসান চৌধুরী: আপনি কবিতার পাশাপাশি প্রবন্ধ-নিবন্ধ লেখার ব্যাপারেও সমান সচ্ছন্দ। আপনার লেখা গদ্য সম্পর্কে আপনার অনুভূতি/মূল্যায়ন জানতে চাই।

রূহুল আমীন খান: প্রত্যেক লেখকেরই একটা নিজস্ব ভঙ্গি থাকে। তেমনি আমারও একটা নিজস্ব ভঙ্গি আছে।

আহমদ হাসান চৌধুরী: আপনার রম্য রচনাসমূহ প্রসঙ্গে জানতে চাই?

রূহুল আমীন খান: আমার রম্য রচনা খুব বেশি একটা নাই। দৈনিক ইনকিলাবে প্রকাশিত রম্য রচনাসমূহ একত্রিত করে 'মামু সমাচার' নামে একটি বই প্রকাশিত হয়েছে।

আহমদ হাসান চৌধুরী: আপনার প্রিয় লেখক কে?

রূহুল আমীন খান: অনেকেই। এর মধ্যে আরবী, ফার্সী, উর্দূ ভাষার অনেকে আছেন, বাংলা ভাষার তো রয়েছেনই। ফার্সী ভাষার মাওলানা জালালুদ্দীন রূমী, আবদুর রহমান জামী, আরবী ভাষার ইমাম শরফুদ্দীন আল বুসিরী, উর্দূ ভাষার আল্লামা ইকবাল।

আহমদ হাসান চৌধুরী: তরুণদের উদ্দেশ্যে আপনার বক্তব্য জানতে চাই।

রূহুল আমীন খান: একটা ঘটনার মধ্য দিয়েই জবাব দিতে চাই। কবি ফররুখ আহমদকে আমি খুব শ্রদ্ধা করতাম। তাঁর সান্নিধ্য আমার বেশ ভালো লাগতো। আমি মাঝে মাঝে যেতাম তার সান্নিধ্যে। একদিন মাগরিবের নামাযের সময় গেলাম তাঁর কাছে। ইস্কাটন মসজিদে নামায পড়লাম একসাথে জামাতে। নামায শেষে কবি সাহেব আমাকে নিয়ে এসে বসলেন মসজিদ সম্মুখস্থ সবুজ ঘাসে আচ্ছাদিত চত্বরে। অনেক গল্প করলেন। বললেন প্রফেসর আবদুল খালিক সাহেবের কাছে বাইআত গ্রহণের কাহিনী। একপর্যায়ে এলো কবিতাচর্চা প্রসঙ্গ। আবেগাপ্লুত কণ্ঠে বললেন, উর্দূ, ফার্সী তো পড়ছেই। এসব ভাষার শ্রেষ্ঠ সাহিত্যগুলো পড়বে। পড়বে মাইকেল, কালীদাস, রবীন্দ্রনাথ। পড়বে মিল্টন, বায়রন, সেক্সপিয়ার, হোমার, পেত্রাকও। সব পড়ে তার মধ্যকার কুফরিটা লাথি মেরে ফেলে দেবে। তৈরি করবে নিজস্ব একটা ভুবন। উঠতে হবে ভয় ও প্রলোভনের উর্ধ্বে। আমাকে যারা ভালোবাসেন তাদের জন্য আমারও এই নসীহত। এ প্রসঙ্গে আলতাফ হোসাইন হালী, বাংলা ভাষার কবি নজরুল ইসলাম, ফররুখ আহমদ, গোলাম মোস্তফা প্রমুখের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এছাড়াও আরও অনেকে আছেন।

আহমদ হাসান চৌধুরী: আপনার সখ সম্পর্কে জানতে চাই।

রূহুল আমীন খান: ভালো বই পড়া, ইসলামী সংগীত শোনা, জাগরণমূলক কবিতা পড়া ও এর আবৃত্তি শোনা, দেশ ভ্রমণ ইত্যাদি।

বাংলা জাতীয় মাসিক
পরওয়ানা
"ঈমান, আমাল ও আকীদা বিষয়ক আপনার যেকোনো প্রশ্ন আজই পরওয়ানার অনুকূলে পাঠিয়ে দিন।???
জীবন জিজ্ঞাসা বিভাগে
প্রশ্ন করার নিয়ম
- শুধুমাত্র প্রশ্নের মূল কথাগুলো লিখে পাঠাতে হবে
- ই-মেইল অথবা ডাকযোগে প্রশ্ন পাঠাতে পারবেন
প্রশ্ন করুন
প্রশ্ন পাঠানোর ঠিকানা
অফিস: ফুলতলী কমপ্লেক্স ঢাকা, ৩৩৪/৪এ, দক্ষিণ গোড়ান, খিলগাঁও, ঢাকা-১২১৯
সিলেট বিভাগীয় অফিস: পরওয়ানা ভবন-৭৪, শাহজালাল লতিফিয়া আ/এ, সোবহানীঘাট, সিলেট
E-mail: parwanabd@gmail.com

আবারও অভুক্ত গাযাবাসীর ওপর বোমাবর্ষণ বিশ্ববাসী নীরব কেন?

এমিনা হোজিচ

"আপু, আমাদের অবস্থা খুবই খারাপ। খাবার জোগাড় করতে পারছি না। এখানে সবকিছুর দাম আকাশছোঁয়া।" এই করুণ বার্তা গাযায় বসবাসরত ১৭ বছর বয়সী রামেজ আমাকে লিখেছিল ১৫ মার্চে। সে আরও লিখে, "আগামীকাল খাওয়ার কোনো ব্যবস্থা নেই। কী খাব, কী করব জানি না। আবারও সেই ক্ষুধা-অনাহার আমাদের গ্রাস করেছে ..."

এর মাত্র তিন দিন পর, পবিত্র রামাদান মাসের সাহরীর পূর্বে, ইসরায়েল ব্যাপক বোমাবর্ষণ শুরু করে। সেই নৃশংস হামলায় ৪৩০ জনেরও বেশি ফিলিস্তিনী প্রাণ হারায়, যাদের মধ্যে ১৮০ জনের বেশি শিশু ছিলো।

পরের দিন রামেজ আমাকে বার্তা পাঠায়, "আল্লাহই জানেন আমরা কী ভয়াবহ পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে যাচ্ছি। আমরা কোনো কিছুই সাথে নিয়ে যেতে পারিনি, এখন রাস্তায় বসবাস করছি। পরিস্থিতি অত্যন্ত দুর্বিষহ।

সবকিছুই হঠাৎ করেই ঘটে গেল, যা আমরা ভাবতেই পারিনি। আমাদের চোখের সামনেই গণহত্যা চলছে আর তারা বোমার নিচেই আমাদেরকে এলাকা ছাড়ার নির্দেশ দিচ্ছে।"

গত বছর ইনস্টাগ্রামের মাধ্যমে রামেজের সাথে আমার পরিচয়। এই ডিজিটাল প্লাটফর্মটি বর্তমানে বিশ্বের কাছে গাযাবাসীর জন্য সাহায্যের আবেদন জানানোর অন্যতম ভরসা। রামেজের পরিবারকে ব্যক্তিগতভাবে আমি চিনি না, গাযার সাথেও ঐতিহাসিক কোনো সম্পর্ক নেই আমার। তবুও ইনস্টাগ্রামের অগণিত ব্যবহারকারীর মধ্যে তার বার্তা আমার কাছেই এসে পৌঁছেছে।

পরবর্তী মাসগুলোতে তার বার্তাগুলো গাযাবাসীর দৈনন্দিন দুর্দশার জীবন্ত দলীলে পরিণত হয়। অস্থায়ী যুদ্ধবিরতি তাদেরকে কিছুটা স্বস্তি দিয়েছিল এবং রামেজ তার ধ্বংসস্তূপে পরিণত হওয়া বাড়িতে ফিরতে পেরেছিল। কিন্তু রামাদানের দ্বিতীয় দিনে ইসরায়েল সব ধরনের সাহায্য বন্ধ করে দেয়। ফলে আবারও শুরু হয় ক্ষুধার বিভীষিকা এবং পবিত্র রামাদানের ১৮তম দিনে দখলদার ইসরায়েল পুনরায় গণহত্যা চালায়।

বার্লিনে ইফতার করার সময় আমি সেসব ফিলিস্তিনী পরিবারের কথা ভাবি যাদের ইফতারের টেবিলে বলতে গেলে কিছুই নেই, যারা পবিত্র আযানের পরিবর্তে শুনে ইসরায়েলি বোমারু বিমানের গর্জন।

এটা কি সত্যিই সম্ভব? মাত্র কয়েক হাজার কিলোমিটার দূরে মানুষ প্রায় পুরোপুরি অভুক্ত থাকছে ও বোমাবর্ষণে প্রাণ হারাচ্ছে। আর আমি পশ্চিমা বিশ্বের কেন্দ্রে দাঁড়িয়ে আছি- যারা গণতন্ত্র ও মানবাধিকারের কথা বলে, কিন্তু গাযার মানুষদের গণহত্যায় সরাসরি সহযোগিতা করছে।

জার্মান নাগরিক হিসেবে আমি যে কর দিই, তা সরাসরি এমন একটি সরকারের কাছে যায়, যে সরকার ফিলিস্তিনীদের বিরুদ্ধে ইসরায়েলের গণহত্যাকে পূর্ণ সমর্থন জানায়। আর এই চিন্তা আমাকে ব্যথিত করে, আতঙ্কিত করে তোলে।

গাযায় ক্ষুধা ও গণহত্যা

রামেজ মাঝেমধ্যেই বিক্ষিপ্তভাবে গাযার ভয়াবহ পরিস্থিতি নিয়ে লিখে থাকে। কিন্তু আমি তাকে আরও বিস্তারিত জানানোর জন্য বলতে পারি না, কারণ সে ও তার পরিবার যে কষ্ট-দুর্ভোগের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে তা জানার শক্তি আমার নেই।

আমি জানি, এমন কিছু দিন ছিলো যেদিন সে কেবল কয়েকটি ফালাফেল (পেঁয়াজু জাতীয় ক্ষুদ্র আকারের খাবার) ও পিঠা খেয়ে কাটিয়েছে। তার স্বপ্ন ছিল উচ্চবিদ্যালয়ে পড়া শেষ করে হিসাববিজ্ঞানে উচ্চশিক্ষা লাভের। কিন্তু এখন তাকে দিনের পর দিন ইনস্টাগ্রামে সাহায্যের আবেদন করতে হচ্ছে এবং ত্রাণসংগ্রহের লিঙ্ক শেয়ার করতে হচ্ছে।

তার বাবা যুদ্ধের আগে আহত হয়েছিলেন এবং বর্তমানে তিনি সেই ব্যথায় ভুগছেন। উনার কাঁধের জয়েন্ট প্রতিস্থাপন করা জরুরি। তাই রামেজকেই তার পরিবারের দায়িত্ব নিতে হয়েছে। তারা দুই ভাই (১৫ ও ১৪ বছর) এবং তিন বোন (২০, ১২ ও ৮ বছর)। বাবা পূর্বে পানি ও বিদ্যুতের মেকানিক ছিলেন, মা গৃহিণী।

যুদ্ধবিরতি ঘোষণার কয়েক সপ্তাহ পর রামেজ পোস্ট করেছিল, "গাযায় ধ্বংস ও ক্ষুধা এখনও বিদ্যমান।" তার পরিবারের অবস্থা তখনও শোচনীয় ছিলো। মানবিক সংস্থা থেকে কিছু খাবার সহায়তা পেলেও তা তাদের চাহিদা মেটানোর জন্য যথেষ্ট ছিল না।

তারা দক্ষিণ গাযায় তাদের ধ্বংসপ্রাপ্ত বাড়িতে ফিরেছিল— যেখানে ইসরায়েলি বোমাবর্ষণে বেসামরিক অবকাঠামো ও ভবনগুলো ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে।

মানবিক সহায়তা কেন্দ্রে পৌঁছাতে রামেজকে দীর্ঘ পথ পাড়ি দিতে হয় এবং সেখান থেকে সে যা ত্রাণসহায়তা পায় তা থেকে তার পরিবহন খরচই অনেক সময় বেশি হয়।

বাজারে কেনার মতো পণ্য পাওয়া গেলেও তার পরিবার অনেক সময়ই তা কিনতে পারে না। ইনস্টাগ্রামে অপরিচিত মানুষের কাছ থেকে মাঝেমধ্যে পাওয়া অনুদান ছাড়া তাদের আয়ের অন্য কোনো উৎস নেই।

ইসরায়েল গাযায় সব ধরনের সাহায্য বন্ধ করে দেওয়ার পর খাদ্যের দাম আকাশছোঁয়া হয়ে যায়। মানবিক সহায়তা হ্রাস পায়, খাদ্য সহায়তা ও স্যুপ কিচেনগুলো সরবরাহের অভাবে বন্ধ হয়ে যায়। সপ্তাহের পর সপ্তাহ ধরে রামেজের পরিবার কোনো সাহায্য পায়নি।

বাজারে এখন শুধু ক্যানড ফুড ও কিছু সবজি পাওয়া যায়। সে আমাকে জানায়, "আমি কিছুই জোগাড় করতে পারছি না। খাদ্যের উচ্চমূল্যের কারণে প্রতিদিন খাবারের জন্য আমার প্রায় ১০০ ডলার প্রয়োজন।"

গাযায় ইসরায়েলের পূর্ণ অবরোধের প্রায় দুই সপ্তাহ পর ১৫ মার্চ ইউনিসেফ রিপোর্ট করে যে, উত্তর গাযায় ২ বছর বয়সের কম শিশুদের মধ্যে অপুষ্টির হার জানুয়ারিতে ১৫.৬% থেকে বর্তমানে ৩১% এ বৃদ্ধি পেয়েছে এবং শেষ কয়েক সপ্তাহের মধ্যে ২৩টি শিশু অপুষ্টি ও পানিশূন্যতায় মারা গেছে। গাযার অন্যান্য অংশেও এই হার দ্রুত বৃদ্ধি পেয়েছে। ইউনিসেফের নির্বাহী পরিচালক ক্যাথরিন রাসেল বলেছেন, "গাযায় শিশুদের মধ্যে এই ভয়াবহ অপুষ্টি সংকট যে গতিতে তৈরি হয়েছে, তা সত্যিই হৃদয়বিদারক।"

শৈশবে অপুষ্টির শিকার হলে আজীবন সেটির প্রভাব পড়ে—যেমন বিভিন্ন রোগের উচ্চ ঝুঁকি, রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা হ্রাস ইত্যাদি। এছাড়াও অপুষ্টিজনিত কারণে জ্ঞানীয় ও শারীরিক

বিকাশ বাধাগ্রস্ত হয়, আচরণগত সমস্যার ঝুঁকি বাড়ে এবং শিক্ষাগত ফলাফল মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। অর্থাৎ, ইসরায়েলের এই অবরোধ- শিশুদের অভুক্ত রাখা গাযার ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে ধ্বংস করছে।

আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের ভূমিকা: গণহত্যাকে উৎসাহিত করা

গত নভেম্বরে আন্তর্জাতিক ফৌজদারি আদালত ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রী ও সাবেক প্রতিরক্ষামন্ত্রীর বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করে গাযায় ইচ্ছাকৃতভাবে বেসামরিক জনগণকে ক্ষুধার্ত রাখাসহ অন্যান্য অভিযোগে। কিন্তু আন্তর্জাতিক আইন মানার দাবিদার পশ্চিমা দেশগুলো প্রকাশ্যে ঘোষণা দেয় যে তারা আইসিসির সিদ্ধান্ত অমান্য করবে এবং নেতানিয়াহুকে স্বাগত জানাবে। সেসব দেশের মধ্যে রয়েছে হাঙ্গেরি, ইতালি, পোল্যান্ড ও জার্মানি। জার্মানির সম্ভাব্য পরবর্তী চ্যান্সেলর সম্প্রতি বলেছেন, "আমার আমলে ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রী বিনা বাধায় জার্মানি ভ্রমণ করতে পারবেন। আমি তা নিশ্চিত করার উপায় খুঁজে বের করব।"

এই ঘোষণাগুলো ইঙ্গিত দেয় যে, পশ্চিমা বিশ্ব ইসরায়েলি নেতাদের অপরাধের জন্য জবাবদিহি করতে আগ্রহী নয়। আর স্বাভাবিকভাবেই আইসিসির গ্রেফতারি পরোয়ানার কোনো প্রতিক্রিয়া না দেখে নেতানিয়াহু গাযায় গণহত্যামূলক ক্ষুধা ও বেপরোয়া বোমাবর্ষণ কেবল পুনরায় শুরুই করেনি, বরং তীব্রতর করেছে।

ইসরায়েল গাযায় সাহায্য সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করে দেওয়ার পর জার্মানি, ফ্রান্স ও ব্রিটেন একটি যৌথ বিবৃতিতে বলেছে, "গাযায় পণ্য ও সরবরাহ বন্ধ করা... আন্তর্জাতিক মানবিক আইন লঙ্ঘনের ঝুঁকি তৈরি করতে পারে।" এই প্রতিক্রিয়া—যা একটি অপরাধকে অপরাধ বলতে অস্বীকার করে— একেবারেই লজ্জাজনক। ব্রিটিশ পররাষ্ট্র সচিব ডেভিড ল্যামি ১৭ মার্চে যখন সাহস করে বলেন যে, গাযায় সাহায্য বন্ধ করে ইসরায়েল প্রকৃতপক্ষে আন্তর্জাতিক আইন ভঙ্গ করছে— তখন তাকে তার নিজ সরকারই তিরস্কার করেছিল।

যদি ইচ্ছাকৃতভাবে বেসামরিক জনগণকে ক্ষুধার্ত রাখা ও বোমাবর্ষণ করা আন্তর্জাতিক আইন ভঙ্গ না হয়, তাহলে এটা কী? পশ্চিমা সরকারগুলো ইসরায়েলের গণহত্যামূলক অপরাধগুলোকে সাধারণ মানুষের কাছ থেকে লুকানোর চেষ্টা করছে আর এই গণহত্যা চেপে রাখার চেষ্টা প্রমাণ করে যে তারাও এই গণহত্যামূলক অপরাধগুলোর সহযোগী।

আন্তর্জাতিক আইন অনুযায়ী পশ্চিমা সরকারগুলোর উচিত গুরুতর আইন লঙ্ঘন বন্ধ করার জন্য ব্যবস্থা নেওয়া, ইসরায়েলের উপর কূটনৈতিক চাপ তৈরি করা, অস্ত্র নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা, বাণিজ্য ও সহযোগিতা সীমিত করা। কিন্তু তারা তা করছে না।

পশ্চিমা মূলধারার মিডিয়াও গণহত্যা বন্ধে পশ্চিমা সরকারগুলোর ভূমিকা ও ব্যর্থতা তুলে ধরার পরিবর্তে ফিলিস্তিনিদের দুর্ভোগকে উপেক্ষা করছে এবং জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করছে। ইসরায়েল অবরোধ ও ত্রাণসহায়তা বন্ধ করার পর গাযায় ক্ষুধার্ত অবস্থা চলমান থাকলেও সেটি শিরোনামও হয়নি পশ্চিমা মিডিয়ায়। ১৮ মার্চের ভয়াবহ গণহত্যা শিরোনাম হয়েছে, তবে তা ইসরায়েলের যুক্তিসহকারে পরিবেশন করা হয়েছে।

পশ্চিমা মিডিয়া ইসরায়েলি কর্মকর্তাদের গণহত্যামূলক বক্তব্যকে নিয়মিতভাবে উপেক্ষা বা হালকা করে দেখায়। সম্প্রতি, ১৯ মার্চ, ইসরায়েলের প্রতিরক্ষামন্ত্রী ইসরায়েল কাৎজ গাযাবাসী ফিলিস্তিনিদের উদ্দেশ্যে বলেছেন, তারা যদি হামাসকে বের করে না দেয় ও ইসরায়েলি বন্দীদের ফেরত না দেয়, তাহলে তাদের "সম্পূর্ণ ধ্বংস"-এর মুখোমুখি হতে হবে। এই গণহত্যার হুমকিকে "সতর্কতা" হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছে, এবং ইসরায়েলের পশ্চিমা মিত্রদের পক্ষ থেকে ডেভিড ল্যামির এক দুর্বল নিন্দা ছাড়া আর কোনো প্রতিক্রিয়া আসেনি।

১৭ মাস ধরে এই ফাঁপা বুলি, বিশ্বাসঘাতকতা ও গ্যাসলাইটিং-এর খেলা দেখে আমি ক্লান্ত। এটি একটি ধ্বংসাত্মক নার্সিসিস্টিক শক্তি প্রদর্শন, যা গণহত্যাকে স্বাভাবিক করার বিরোধী মানুষদের ক্লান্ত করে দিতে চায়—আমাদের ভেঙে দিতে চায়। কিন্তু আমি এমন এক অবস্থায় পৌঁছেছি যেখানে আমি আর এই অপ্রতিরোধ্য অন্যায়ের মুকাবিলায় অসহায় ও ক্লান্তবোধ করতে রাজি নই।

রামাদান হলো ঈমানের শক্তি পুনরুজ্জীবিত করার সময়। এটি ত্যাগের সময়, সাথে আনন্দ, সম্প্রীতি ও আত্ম-উন্নয়নেরও সময়। আমি ইসরায়েল ও তার মিত্রদেরককে ন্যায়বিচারের উপর আমার বিশ্বাসকে নস্যাৎ করতে দেব না। গাযাবাসী আমাদের শিখিয়েছে যে কোনো পরিস্থিতিতেই কিভাবে বিশ্বাস ধরে রাখতে হয় ও দৃঢ় থাকতে হয়। আমি এই বিশ্বাস ধরে রাখব যে, আমাদের কণ্ঠস্বর ও কর্ম—যত ছোটই হোক না কেন—পরিবর্তনে অবদান রাখতে পারে। আমাদের সচেতনতা বৃদ্ধি ও সরকারগুলোর উপর চাপ তৈরি করা বন্ধ করা যাবে না। আমাদের শক্তি হলো একসাথে দাঁড়ানো এবং একে অপরকে বিশ্বাস রাখতে, ন্যায়বিচারের জন্য লড়াই চালিয়ে যেতে অনুপ্রাণিত করা। প

(বার্লিনভিত্তিক মাল্টিমিডিয়া সাংবাদিক এমিনা হোজিচ এর লেখা প্রবন্ধটি আন্তর্জাতিক গণমাধ্যম আল জাজিরা থেকে মাসিক পরওয়ানা পাঠকদের জন্য বাংলা ভাষায় অনুবাদ করেছেন মহসিন আহমদ)

বাংলা জাতীয় মাসিক
পরওয়ানা
বিজ্ঞাপনের হার

শেষ প্রচ্ছদ (চার রং)
৪০,০০০/-
২য় ও ৩য় প্রচ্ছদ (চার রং)
৩০,০০০/-
ভিতরের পূর্ণ পৃষ্ঠা (সাদা কালো)
১৮,০০০/-
ভিতরের অর্ধ পৃষ্ঠা (সাদা কালো)
১০,০০০/-
ভিতরের সিকি পৃষ্ঠা (সাদা কালো)
৬,০০০/-
ভিতরের পূর্ণ পৃষ্ঠা (চার রং)
২৫,০০০/-
ভিতরের অর্ধ পৃষ্ঠা (চার রং)
১২,০০০/-
ভিতরের এক কলাম ৩" ইঞ্চি (সাদা কালো)
৩,০০০/-

বি. দ্র: একসাথে তিন মাসের জন্য ২৫%, ছয় মাসের জন্য ৩৫% ও এক বছরের জন্য ৫০% ডিসকাউন্ট দেওয়া হবে।

যোগাযোগ
বিজ্ঞাপন ম্যানেজার
মাসিক পরওয়ানা
মোবাইল: ০১৭৯৯৬২৯০৯০

ভিজিট করুন
তাসনীম
www.tasneembd.org
▼কুরআন ▼হাদীস ▼আকীদা
▼ইবাদত ▼প্রবন্ধ ▼জীবনী
▼জিজ্ঞাসা ▼বই

মাওলানা রূমীর মসনবী শরীফ

দয়ালু খলীফা ও বেদুইন দম্পতি

ড. মাওলানা মুহাম্মদ ঈসা শাহেদী

আগেকার দিনে বাগদাদের এক খলীফা ছিলেন অত্যন্ত দানশীল ও ন্যায়বিচারক। তার দয়া-দাক্ষিণ্য ও বদান্যতা কেবল নিজ দেশের জনগণের জন্য অবারিত ছিল না; বরং দূরের-কাছের অন্য মানুষও তার দানশীলতার ছায়ায় আশ্রয় পেত।

এক বেদুইন মহিলা স্বামীর কাছে মনের দুঃখ বেদনা ব্যক্ত করছিল রাতের অবসরকে নাগালে পেয়ে। কারণ, সারাদিন মহিলাদের পরিশ্রমের অন্ত নেই। ঘরের যাবতীয় কাজ নিজ হাতে আঞ্জাম দিতে হয়। রান্নাবান্না ছাড়াও বাচ্চাদের লালন-পালন, গৃহপালিত পশুর দেখাশোনার দায়িত্বও তাদেরকেই পালন করতে হয়। ফলে সারা দিনমান একটুও ফুরসত থাকে না তাদের হাতে। পুরুষরা থাকে অন্য কাজ নিয়ে ব্যস্ত। পুরো পরিবার সামাল দেয়ার ঘানি টানতে হয় একা মহিলাদেরই। সংসারের সব কাজ গুছিয়ে কেবল রাতের বেলা একটুখানি সময় পায় তারা। তখন জীবনের সুখ-দুখের কথা বলে আপনজনদের কাছে।

একদিন রাতে বেদুইন মহিলা সংসারের নিদারুণ টানাপোড়েন, নিঃস্ব-সম্বলহীনতার করুণ কাহিনী শুরু করে স্বামীর সনে। স্বামীর ঘরের অভাব-অনটনের ফিরিস্তি দিতে তাঁর ভাষা হয়ে যায় কর্কশ। এক পর্যায়ে মহিলা স্বামীকে তিরস্কার করে বলল, আরবদের বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো, যুদ্ধ, লড়াই, লুটতরাজ। কিন্তু তুমি? ওহে আমার স্বামীধন! তোমার তো মুরদ বলতে কিছু নেই। অভাব অনটনের নিগড়ে দিনের পর দিন কেটে যাচ্ছে; অথচ আরবদের এই স্বভাবটুকু তোমার মধ্যে জাগছে না। আরব ঐতিহ্যের কিছুই তোমার নসীবে নাই। সাহস বীরত্ব বলতে তোমার আছে শুধু ঘরকুনো হয়ে থাকার ব্যারাম। আমাদের ঘরে মেহমান আসে। মেহমানের আতিথেয়তা আরব ঐতিহ্যের অলঙ্কার। অথচ মেহমানের সামনে দেওয়ার মত তোমার ঘরে কিছুই থাকে না। এরপরও যদি কোন মেহমান আমাদের ঘরে আসে। বাধ্য হয়ে রাতের আঁধারে তার জামার পকেট হাতড়াতে হয়। মেহমানের পকেট চুরি করে ক্ষুধার জ্বালা মেটানো ছাড়া অন্য কোন উপায় থাকে না আমাদের।

স্ত্রীর বকুনি খেয়ে বেদুইন স্বামী দরদী ভাষায় স্ত্রীকে বুঝানোর চেষ্টা করে। বলে যে, এই দুনিয়ার আরাম আয়েশ একেবারেই ক্ষণস্থায়ী। এখানকার সুখসম্ভোগে মত্ত হওয়া বুদ্ধিমানের কাজ নয়। যারা এসবের উর্ধ্বে উঠতে পেরেছে তারাই জীবনে সুখী হয়েছে। বেদুইন তার স্ত্রীকে যুক্তি দিয়ে বুঝায়, দেখ পশুপাখিরা, জীবনের সুখ-সম্ভোগ নিয়ে অত ভাবে না। জীবন জীবিকার দুশ্চিন্তা তাদের নেই। কোন খাবার জমা করে রাখে না। অর্থ সম্পদ জমানোর সিন্দুকের চিন্তা থেকে তারা মুক্ত। তারা শুধু আজকের দিন নিয়েই ভাবে। তাদের বাকির খাতায় শূন্য থাকে। আগামীকালের ভাবনায় রাত কাটায় না। ফলে তারা সুখী। সকালে বেরিয়ে যায়, রাতে ফিরে। কেউ তো উপোস থাকে না। জীবিকা নির্বাহের জন্য ওদের ভরসা কার্যকারণ, উপায় ও অবলম্বনের পরিবর্তে যিনি কার্যকারণের মূল নিয়ন্তা তার উপরে। একেই পরিভাষায় বলা হয় তাওয়াক্কুল। চলো আমরা আল্লাহর উপর ভরসার জীবন নিয়ে সুখী হই।

স্বামীর মুখে এমন উপদেশ শুনে তেলে বেগুনে জ্বলে ওঠে বেদুইন মহিলা। অল্পেতুষ্টির জীবনযাপনের যেসব নসীহত স্বামী খাইরাত করল তার গোষ্ঠীশুদ্ধ উদ্ধার করে।

স্বামী বারবার স্ত্রীকে বুঝানোর চেষ্টা করে, ধনাঢ্যতার চেয়ে দারিদ্রের উপকার অনেক বেশি। কিন্তু স্ত্রী কোন যুক্তিই মানতে রাজি নয়। তার সাফ কথা, নিজের মুরদ নাই তাই এসব কথায় আত্মপ্রবঞ্চনায় তোমার দিন যায়। আর যত দুঃখ-যাতনা তা যায় আমার মাথার উপর দিয়ে। এভাবে তাদের তর্ক বচসা চলতে থাকে রাতের দৈর্ঘ্য মেপে মেপে। স্বামী কিছুতেই শান্ত করতে পারে না স্ত্রীকে। শেষ পর্যন্ত হুমকির পথ বেছে নিতে হয় তাকে। বলে, যদি তুমি এমন দুর্ব্যবহার চালাতে থাক, মুখে যাই আসে তাই বলে যাও, আমার মান-ইজ্জতের এতটুকুন লেহাজ যদি তোমার না থাকে, যদি কথার বাণ নিক্ষেপে আমার কলিজা খানখান করতে তোমার এতই স্বাদ লাগে তাহলে আমার সামনে একটি পথই খোলা আছে। তুমি একবারেই স্বাধীন হয়ে যাও। তোমার মুখে আর লাগামের দরকার হবে না। তোমার সাথে আমার বনিবনার সকল চেষ্টা ব্যর্থ হয়ে যাচ্ছে। এখন একটাই পথ, আর তা হচ্ছে বিচ্ছেদ। তুমি তালাক নিয়ে নাও আর আমি চলে যাই নিরুদ্দেশে। সংসারের সবকিছু তোমার থাকবে, আমি হব ভবঘুরে। কপালের লিখন যা তা-ই হবে আমার জীবনে।

স্বামীর কণ্ঠে রাগের আগুন দেখে স্ত্রীর সুর পাল্টে যায়। প্রথমে রাগের অস্ত্র অকার্যকর দেখে আরেকটি অস্ত্র বের করে যা ধারালো তরবারীর চেয়েও সুতীক্ষ্ণ। তার এই অস্ত্র আবেগের। মুহূর্তে দু'চোখ বেয়ে বয়ে যায় অশ্রুর সয়লাব। হ্যাঁ, এই সেই অস্ত্র, যা সচরাচর মহিলারা প্রয়োগ করে আর পুরুষকে তাদের ইচ্ছার সামনে পরাজয় মানতে বাধ্য করে।

বেদুইন স্বামী স্ত্রীর কান্নাবানে একেবারে কাবু হয়ে যায়। স্ত্রীর কাছে আত্মসমর্পন করে। এতক্ষণ যা কিছু বলেছে তার জন্য অনুতপ্ত হয়। অনুশোচনায় দাঁতে আঙ্গুল কামড়ায়। বলে, তুমি আমাকে মাফ করে দাও। যা কিছু বলেছি ভুলে যাও। এখন থেকে তোমার কথার বাইরে

এক কদমও চলব না। শান্ত হয়ে যাও লক্ষীটি আমার।

স্ত্রী শান্ত হয়। দু'জনের মাঝে পরামর্শ হয় জীবনে সুখী হওয়ার নানা দিক নিয়ে। স্ত্রী পরামর্শ দেয়, সারা জীবন মরুভূমিতে জানকান্দানি করলেও ভাগ্যের পরিবর্তন করতে পারব না আমরা। কপাল বদলতে হলে যে ভাবেই হোক বাগদাদে খলীফার দরবারে যেতে হবে। তার কাছ থেকে কিছু পাওয়ার জন্য সাধনা করতে হবে। সফরের কষ্ট স্বীকার করতে হবে। যে কোনো কৌশলে আমাদের অসহায় অবস্থার প্রতি খলীফার দয়ার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে হবে।

স্ত্রীর প্রস্তাব মনঃপূত হয় বেদুইনের। কিন্তু খালি হাতে যে যাওয়া যাবে না, প্রবেশের অনুমতি মিলবে না মহান খলীফার দরবারে। তার দরবারে নেয়ার মত উপযুক্ত কি আছে আমাদের ঘরে? অনেক চিন্তা-ভাবনার পর স্ত্রী বলে, মরুভূমিতে সবচে দামি, সবচে প্রিয় জিনিস পানি। বৃষ্টির পানি যদি ধরে রাখা যায় তার চেয়ে মূল্যবান কোন তোহফার কথা চিন্তা করা যায় না। স্ত্রী বুঝিয়ে বলল, চল একটি মশকে আমরা বৃষ্টির পানি ভর্তি করি আর তা নিয়ে তুমি যাও সুদূর বাগদাদে খলীফার মহান দরবারে। প্রমোত্ত দজলা নদী যে বাগদাদের মাঝখান দিয়ে প্রবাহিত আর তাতে থৈথৈ বিশাল জলরাশি সে তথ্য স্বামী-স্ত্রী কারো জানা ছিল না।

স্বামী স্ত্রী পানির মশকটি কাঁথা-কম্বল দিয়ে মুড়িয়ে নিল। যাতে মরুর তাপদাহে পানি গরম না হয়। মরুভূমি বা গাঁয়ের বধূরা এভাবেই পানির শীতলতা সংরক্ষণ করে উষ্ণ তাপমাত্রা হতে।

বেদুইন পানির কলসি কাঁধে রওনা হয় বাগদাদ অভিমুখে। মরুভূমির ঝড়-তুফান, চড়াই-উতরাই অতিক্রম করে এগিয়ে যায় তার যাত্রা। এদিকে স্ত্রী জায়নামাযে বসে দু'হাত তুলে দোয়া মাগে মহান আল্লাহর দরবারে। তার স্বামী যেন নিরাপদে, কোন চোট-হোঁচট ব্যতিরেকে বাগদাদ পৌঁছতে পারে। স্বামীর পথ চলা যেন স্বচ্ছন্দ হয়, কোনো শত্রু বাধাবিঘ্ন যেন তার অন্তরায় না হয়।

শেষ পর্যন্ত বেদুইন খলীফার দরবারে উপনীত হয়। দরবারের প্রহরী, লোকজন এগিয়ে আসে আগন্তুকের দিকে। তার ক্লান্ত চেহারা, ধূলোমলিন অবয়ব দেখে তারা বুঝে নেয় কি জন্য এসেছে। কী নিয়ে এসেছে। তারা সানন্দে বরণ করে নেয় মরুভূমির মেহমানকে। তার কাঁধের মশক মরুভূমির উপঢৌকন নামিয়ে নিয়ে যায় মহামান্য খলীফার সম্মুখে। খলীফা অবগত হন বেদুইনের দুঃখকষ্টের জীবনের অনেক অজানা কাহিনী। তিনি হুকুম দিলেন, বেদুইন পানির যে মশক নিয়ে এসেছে তা স্বর্ণ আর রৌপ্য মুদ্রা দিয়ে ভরে দাও। তার আরো যত অভাব ও চাহিদা আছে পূরণ করে দাও। তিনি নির্দেশ দিলেন, তাকে একটি নৌকায় করে দজলা নদীর মাঝ দিয়ে তার বাড়ির ঠিকানায় পৌঁছিয়ে দেয়ার ব্যবস্থা কর।

স্বর্ণমুদ্রাভর্তি মশক পেয়ে বেদুইনের আনন্দ আজ বাঁধনহারা। কিন্তু যখন নৌকায় চড়ে বাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা হলো, দজলার বুকে এসে সে বিস্ময়ে হতবাক। মনে মনে বলে, আমি তো খলীফার দরবারে নিয়ে এসেছিলাম এক মশক পানি। অথচ খলীফার কাছে দেখছি প্রমোত্ত দজলা। এই বিশাল জলরাশি যার আছে তার কাছে আমি এক মশক পানি কীভাবে উপঢৌকন হিসেবে নিয়ে আসলাম। এ কেমন লজ্জার কাজ হলো। মুহূর্তে বেদুইনের চোখ খুলে যায়, স্বচ্ছ নির্মল অগাধ পানিভান্ডারের মালিকের কাছে আমি সামান্য এক মশক পানি আনলাম। তা-ই তিনি সানন্দে গ্রহণ করলেন। কী আশ্চর্য! এর বদলায় তিনি আমার মশক স্বর্ণে মনিমানিক্যে ভরে দিলেন। সত্যিই এ বাদশাহ কত মহান, কত অগাধ তার ভান্ডার। কত মহিয়ান তিনি। বান্দার তুচ্ছ উপহার সানন্দে বরণ করে বিনিময়ে দেন শতসহস্র গুণ। সত্যিই তার বদান্যতা অসীম অপার।

এই কাহিনীর সূত্র রয়েছে শাইখ ফরীদুদ্দীন আত্তার (র.)-এর 'মুসীবতনামা' গ্রন্থে আর মুহাম্মদ উফী রচিত 'জাওয়ামিউল হিকায়াত' পুস্তকে। তবে পুরো কাহিনীতে খলীফা হচ্ছেন মহামহিম আল্লাহর রূপক আর বেদুইন দম্পতির চরিত্রে ফুঠে উঠেছে আল্লাহর মুখলিস বান্দাদের জীবনচিত্র। প

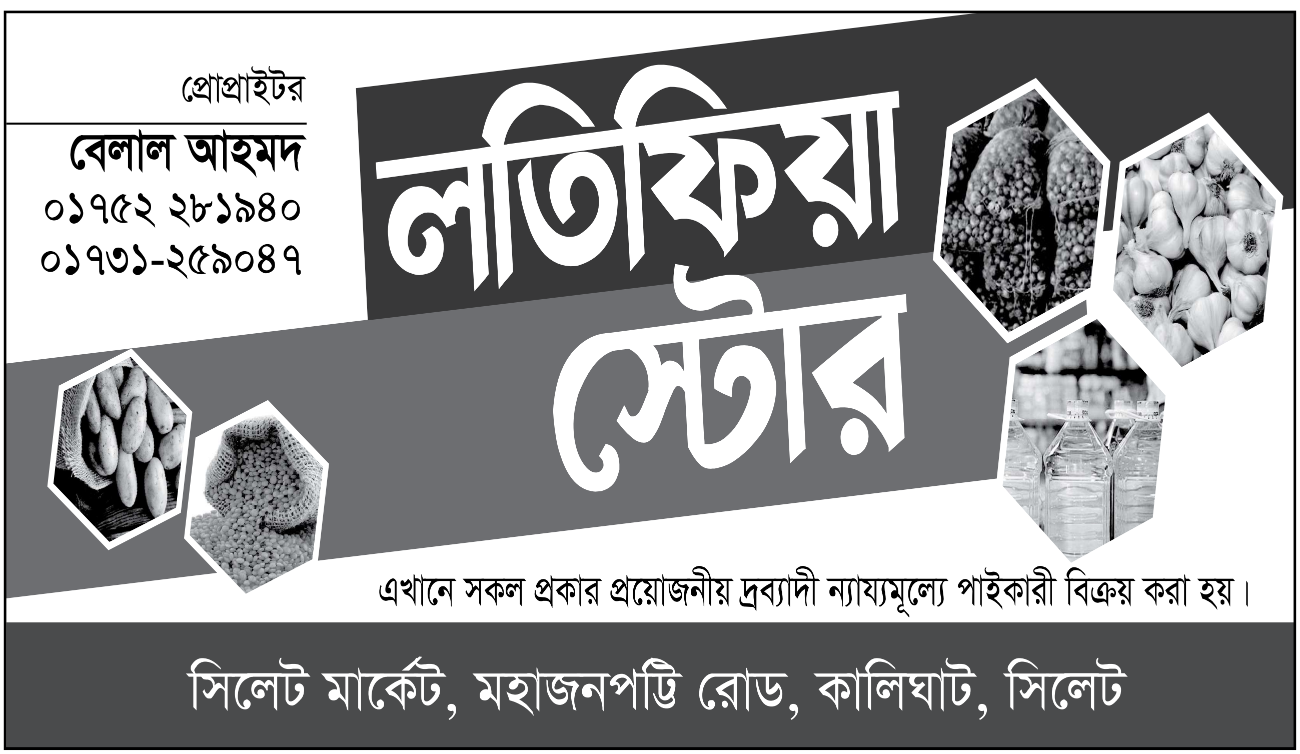

এই মাসে এই চাঁদে

পরওয়ানা ডেস্ক:

বাইতুল মুকাদ্দাস ইসলামের তৃতীয় পবিত্রতম স্থান। যা জেরুযালেম শহরে অবস্থিত। বাইতুল মুকাদ্দাস বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্যের অধীনে থাকাকালীন খ্রিস্টানদের প্রধান শক্তিশালী সাম্রাজ্য ছিল। রোমান সম্রাট হিরাক্লিয়াস (Heraclius) পূর্ব রোমান সম্রাজ্যের বিভিন্ন অংশে শাসন করতেন এবং মুসলমানদের বিরুদ্ধে একাধিকবার যুদ্ধও করেছেন। খলীফা হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব (রা.) এর শাসনামলে মুসলমানরা একের পর এক রোমান অধিকৃত অঞ্চল জয় করেছিল।

১৫ হিজরীতে সংঘটিত বিখ্যাত ইয়ারমুক যুদ্ধে মুসলমানরা রোমান বাহিনীকে পরাজিত করে। এরপর মুসলিম বাহিনী ধারাবাহিকভাবে সিরিয়ার বিভিন্ন অংশ জয় করতে থাকে, যার মধ্যে দামেস্ক, হিমস ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ শহরও ছিল।

বাইতুল মুকাদ্দাস অবরোধ ও বিজয়

মুসলিম বাহিনীর প্রধান সেনাপতি হযরত আবূ উবাইদা ইবনুল জাররাহ (রা.), বিশিষ্ট মুসলিম সেনাপতি খালিদ বিন ওয়ালিদ (রা.), শুরাহবিল ইবন হাসানা (রা.) ও আমর ইবনুল আস (রা.) এর নেতৃত্বে মুসলিম বাহিনী বাইতুল মুকাদ্দাসের চারপাশে অবস্থান নেয় এবং শহরটি ঘিরে ফেলে। শহরের তৎকালীন শাসক প্যাট্রিয়ার্ক সোফ্রোনিয়াস মুসলমানদের প্রতিরোধের চেষ্টা করেন, কিন্তু দীর্ঘদিন তারা অবরুদ্ধ থাকার ফলে তাদের খাদ্য ও পানির সংকট দেখা দেয়। রোমান সম্রাট হেরাক্লিয়াস তাদেরকে কোনো সাহায্য পাঠাতে পারেননি, কারণ তিনি ইতোমধ্যে ইয়ারমুক যুদ্ধে পরাজিত হয়ে সিরিয়া ছেড়ে কনস্টান্টিনোপলে (বর্তমান তুরস্ক) পালিয়ে যান। দীর্ঘদিন অবরুদ্ধ থাকার পর বাইতুল মুকাদ্দাসের শাসক সোফ্রোনিয়াস শর্ত দেন যে, তিনি শহরটির চাবি মুসলমানদের খলীফার হাতে হাতে তুলে দেবেন। এই সংবাদ শুনে খলীফা হযরত উমর (রা.) নিজে মদীনা থেকে জেরুযালেমে আসার সিদ্ধান্ত নেন। খলীফা হযরত উমর (রা.) এর সেই যাত্রা ছিল একটি ঐতিহাসিক যাত্রা। হযরত উমর (রা.) অত্যন্ত সাধারণ জীবনযাপন করতেন। তিনি একজন দাসকে সঙ্গে নিয়ে একটি উটে সফর করেন, একটিমাত্র উট হওয়ার কারণে তারা পালাক্রমে চড়ে জেরুযালেমের দিকে যাত্রা করেন। যখন তারা জেরুযালেম শহরে পৌঁছলেন তখন উটে চড়ার পালা ছিল দাসের, আর খলীফা উমর (রা.) হেঁটে যাচ্ছিলেন।

জেরুযালেমের প্রধান খ্রিস্টান নেতারা এ দৃশ্য দেখে স্বাভাবিকভাবেই উটে আরোহনকারী দাসকে খলীফা মনে করলো। কিন্তু পরে যখন জানতে পারলো উটের রশি ধরা অবস্থায় যিনি ছিলেন তিনিই উমর তখন তারা বিস্মিত হয়ে গেলো এবং বুঝতে পারলো এটাই সত্যিকারের ন্যায়পরায়ণ শাসকের গুণ। হযরত উমর (রা.)-এর আগমনের পর সোফ্রোনিয়াস নিজ হাতে শহরের চাবি হযরত উমর (রা.)-এর কাছে হস্তান্তর করেন। কোনো যুদ্ধ ছাড়াই বাইতুল মুকাদ্দাস মুসলমানদের দখলে চলে আসে। এরপর হযরত উমর (রা.) বাইতুল মুকাদ্দাসের গুরুত্বপূর্ণ জায়গা পরিদর্শন করেন, যার মধ্যে মসজিদুল আকসার স্থান অন্যতম।

বিজয়ের পর হযরত উমর (রা.) উদারতা প্রকাশ করেন। হযরত উমর (রা.) বাইতুল মুকাদ্দাসের অমুসলিম অধিবাসীদের জন্য বিশেষ নিরাপত্তা ঘোষণা করেন এবং তাদের সাথে একটি সন্ধি করেন, যা ইতিহাসে "উমরের সন্ধি" নামে পরিচিত। এই চুক্তির উল্লেখযোগ্য দিক হলো

* খ্রিস্টানদের গির্জা ধ্বংস করা হবে না।

* জোরপূর্বক কাউকে ইসলাম গ্রহণে বাধ্য করা হবে না।

* খ্রিস্টানরা তাদের ধর্ম পালনে সম্পূর্ণ স্বাধীন থাকবে।

মসজিদ নির্মাণ ও পরিচ্ছন্নতা অভিযান

হযরত উমর (রা.) যখন বাইতুল মুকাদ্দাসে প্রবেশ করেন, তখন সেখানে প্রচুর ময়লা ও আবর্জনা দেখতে পান। তিনি নিজ হাতে জায়গাটি পরিষ্কার করেন এবং সেখানে একটি মসজিদ নির্মাণ করেন, যা আজও মসজিদে উমর নামে বিদ্যমান।

এই বিজয়ের পর বাইতুল মুকাদ্দাস সুদীর্ঘ ৪৬২ বছর মুসলিম শাসনের অধীন থাকে। ক্রুসেডাররা ১০৯৯ সালে এটি দখল করে। পরে ৫৮৩ হিজরীতে (১১৮৭ খ্রিস্টাব্দ) সালাহুদ্দীন আইউবী আবার এটি মুসলমানদের অধীনে আনেন।

বাইতুল মুকাদ্দাস বিজয়ের গুরুত্ব ও প্রভাব

বাইতুল মুকাদ্দাস বিজয়ের মাধ্যমে সেখানে ইসলামী শক্তির উত্থান ঘটে এবং মুসলিমদের ক্ষমতা সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। পাশাপাশি এটি মুসলমানদের ধর্মীয় ও রাজনৈতিক শক্তির অন্যতম কেন্দ্র হয়ে ওঠে। মুসলমানদের উদারতা ও ন্যায়নিষ্ঠ শাসন দেখে বাইতুল মুকাদ্দাসের খ্রিস্টান ও ইয়াহুদী সম্প্রদায় ইসলামের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হন। মুসলমানদের প্রতি বিশ্ববাসীর দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন হয়। অনেক অমুসলিম স্বেচ্ছায় ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন।

এই বিজয়ের পর মুসলমানরা বাইতুল মুকাদ্দাসে অসংখ্য স্থাপনা গড়ে তোলেন, যার মধ্যে কুব্বাতুস সাখরা বা (Dome of the Rock) অন্যতম।

বাইতুল মুকাদ্দাস বিজয় ইসলামী ইতিহাসের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিজয় হিসেবে পরিগণিত হয়। এবং এটি শুধুমাত্র মুসলমানদের একটি সামরিক বিজয় ছিল না; এটি ছিল ইসলামের উদার, ন্যায়বিচার ও মহানুভব শাসনের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। ইসলামের দ্বিতীয় খলীফা উমর (রা.)-এর শাসনামলে মুসলমানরা যে উদারতা দেখিয়েছিল, তা আজও বিশ্ব ইতিহাসে এক অনন্য উদাহরণ হিসেবে লেখা রয়েছে। ১৬ হিজরীর (৬৩৭ খ্রিস্টাব্দ) এর শাওয়াল মাসে ঐতিহাসিক এই ঘটনাটি ঘটে।

জীবন জিজ্ঞাসা

জবাব দিচ্ছেন-

মাওলানা আবূ নছর মোহাম্মদ কুতুবুজ্জামান তাফাদার

প্রিন্সিপাল ও খতীব, আল ইসলাহ ইসলামিক সেন্টার
মিশিগান, আমেরিকা

প্রশ্ন: তারাবীর মধ্যে ধারাবাহিকতা পরিহার করে এমনকি উলটা পালটা সূরা পড়লে যেমনঃ সূরা ফীল তিলাওয়াত করার পর সূরা নাসর, এবং সূরা লাহাব তিলাওয়াত করার পর সূরা ফীল তিলাওয়াত করলে কি নামায হবে?

জবাব: ফরয বা ওয়াজিব নামাযে ইচ্ছাকৃতভাবে ধারাবাহিকতার বিপরীতে উলটা পালটা সূরা পড়লে তা মাকরূহে তাহরীমী। তবে এতে সাহু সিজদাহ ব্যতীত নামায শুদ্ধ হয়ে যাবে। অবশ্য ফরয বা ওয়াজিব নামাযে ভুলবশতঃ এমনটা হলে মাকরূহ নয়। আর নফল নামাযে ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় কিরাত উলটা পালটা পড়লেও মাকরূহ হবে না। তাই তারাবীহ নামাযে ধারাবাহিকতার বিপরীতে উলটা পালটা সূরা পড়লেও মাকরূহ হবে না।

এ সম্পর্কে আদ দুররুল মুখতার কিতাবে লিখেছেন-

ويكره الفصل بسورة قصيرة وأن يقرأ منكوسا إلا إذا ختم فيقرأ من البقرة وفي القنية: قرأ في الاولى الكافرون وفي الثانية – ألم تر (الفيل: ١) – أو – تبت (المسد: ١) – ثم ذكر يتم، وقيل يقطع ويبدأ، ولا يكره في النفل شئ من ذلك

(আদ দুররুল মুখতার, পৃষ্ঠা-৭৫)

প্রশ্ন: পুরুষ এবং মহিলাদের মধ্যখানে কোন পর্দা না থাকে তাহলে মহিলারা পুরুষের পেছনে জামাআতের সাথে খতম তারাবী পড়তে পারবে কি?

জবাব: মহিলাদের জন্য জামাআতে নামায আদায়ের উদ্দেশ্যে মসজিদে উপস্থিতি মাকরূহ। চাই তারাবীহ, জুমুআ বা অন্য যেকোন নামাযের জামাআত হোক না কেন। যদি কোনো ঘরে তারাবীহ বা অন্য যেকোন নামাযের জামাআত পুরুষের ইমামতিতে হওয়াকালে তার পিছনে অন্যান্য পুরুষেরা নামায আদায় করে এবং কোন মহিলা বাহির থেকে আসা ব্যতীত উক্ত ঘরের মহিলারা পিছনে পর্দার সহিত উক্ত জামাআতে অংশগ্রহণ করে এবং ইমাম তাদের ইকতিদার নিয়ত করে থাকেন তাহলে তাদের উক্ত নামায শরীআতের দৃষ্টিতে মাকরূহ ব্যতীত জায়িয। তবে এমতাবস্থায় পর্দা ব্যতীত গায়র মাহরাম নারী মুকতাদীদের ইমামতি করা মাকরূহ হবে। আর কোন জামাআতে ইমাম ব্যতীত সকল মুকতাদী নারী হলে এবং উক্ত জামাতে ইমামের স্ত্রী কিংবা কোন মাহরাম না থাকেন অথবা জামাআতে আরো পুরুষ মুকতাদী থাকেন কিংবা বাহির থেকে নারীরা কোন নিয়মতান্ত্রিক ব্যবস্থাপনা ছাড়া এসে থাকে এ সকল ক্ষেত্রে ইমামের জন্য তাদের ইমামতি করা মাকরূহ। তাই এরূপ পন্থা পরিহার করা উচিত। এ সম্পর্কে রদ্দুল মুহতার কিতাবে লিখেছেন-

(وَيُكْرَهُ حُضُورُهُنَّ الْجَمَاعَةَ) وَلَوْ لِجُمُعَةٍ وَعِيدٍ وَوَعْظٍ (مُطْلَقًا) وَلَوْ عَجُوزًا لَيْلًا (عَلَى الْمَذْهَبِ) الْمُفْتَى بِهِ لِفَسَادِ الزَّمَانِ، وَاسْتَثْنَى الْكَمَالُ بَحْثًا الْعَجَائِزَ وَالْمُتَفَانِيَةَ (كَمَا تُكْرَهُ إمَامَةُ الرَّجُلِ لَهُنَّ فِي بَيْتٍ لَيْسَ مَعَهُنَّ رَجُلٌ غَيْرُهُ وَلَا مَحْرَمٌ مِنْهُ) كَأُخْتِهِ (أَوْ زَوْجَتِهِ أَوْ أَمَتِهِ، أَمَّا إذَا كَانَ مَعَهُنَّ وَاحِدٌ مِمَّنْ ذُكِرَ أَوْ أَمَّهُنَّ فِي الْمَسْجِدِ لَا) يُكْرَهُ

(রদ্দুল মুহতার, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-৫৬৬)

প্রশ্ন: আমি এ বৎসর ইতিকাফে ছিলাম। প্রথম দুইদিন না জেনে অভ্যাসবশত সকালে স্বাভাবিক গোসল করেছি। দুইদিন পরে একজন বললেন ইতিকাফ অবস্থায় ফরয গোসল ব্যতীত গোসল করলে ইতিকাফ নষ্ট হয়ে যাবে। আমার জানার বিষয় হলো, আমার ইতিকাফ কি ভেঙ্গে গেছে। এই অবস্থায় আমার করণীয় কী?

জবাব: রামাদান মাসের শেষ দশকের ইতিকাফ সুন্নাতে মুয়াক্কাদায়ে কিফায়াহ। উক্ত ইতিকাফ অবস্থায় ফরয গোসল ব্যতীত সাধারণ গোসল করার জন্য মসজিদ থেকে বের হওয়া দুরুস্ত নয়। তবে কেউ প্রশ্রাব, পায়খানার প্রয়োজনে মসজিদ থেকে বের হয়ে ফিরে আসার পথে স্বল্প সময়ে যদি অতি দ্রুত গোসল করে নেয়, তাতে ইতিকাফ নষ্ট হবে না। তবে ফরয গোসল ব্যতীত সাধারণ গোসলের উদ্দেশ্য বাইরে বের হলে ইতিকাফ ভঙ্গ হয়ে যাবে। তাই পরবর্তীতে উক্ত দিনের ইতিকাফের কাযা করে নেয়া আবশ্যক। পরবর্তী দিনগুলো যথারীতি ইতিকাফ করে যাবেন। এ সম্পর্কে আল ফাতাওয়াল হিন্দিয়্যাহ কিতাবে লিখেছেন-

(وَأَمَّا مُفْسِدَاتُهُ) فَمِنْهَا الْخُرُوجُ مِنْ الْمَسْجِدِ فَلَا يَخْرُجُ الْمُعْتَكِفُ مِنْ مُعْتَكَفِهِ لَيْلًا وَنَهَارًا إلَّا بِعُذْرٍ، وَإِنْ خَرَجَ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ سَاعَةً فَسَدَ اعْتِكَافُهُ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى كَذَا فِي الْمُحِيطِ. سَوَاءٌ كَانَ الْخُرُوجُ عَامِدًا أَوْ نَاسِيًا هَكَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ. وَلَا تَخْرُجُ الْمَرْأَةُ مِنْ مَسْجِدِ بَيْتِهَا إلَى الْمَنْزِلِ هَكَذَا فِي مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ، وَلَوْ كَانَتْ الْمَرْأَةُ مُعْتَكِفَةً فِي الْمَسْجِدِ فَطَلُقَتْ لَهَا أَنْ تَرْجِعَ إلَى بَيْتِهَا وَتَبْنِي عَلَى اعْتِكَافِهَا كَذَا فِي التَّبْيِينِ. (وَمِنْ الْأَعْذَارِ الْخُرُوجُ لِلْغَائِطِ وَالْبَوْلِ، وَأَدَاءِ الْجُمُعَةِ) فَإِذَا خَرَجَ لِبَوْلٍ أَوْ غَائِطٍ لَا بَأْسَ بِأَنْ يَدْخُلَ بَيْتَهُ وَيَرْجِعَ إلَى الْمَسْجِدِ كَمَا فَرَغَ مِنْ الْوُضُوءِ، وَلَوْ مَكَثَ فِي بَيْتِهِ فَسَدَ اعْتِكَافُهُ،

(আল ফাতাওয়াল হিন্দিয়্যাহ, ১ম খণ্ড,পৃষ্ঠা-২১২)

এ সম্পর্কে খাজানাতুল মুফতীন কিতাবে লিখেছেন-

ولا يخرج المعتكف من المسجد إلا لحاجةٍ لازمةٍ شرعيّةٍ كالجمعة، أو لحاجةٍ طبيعيةٍ كالبول، والغائط....... ولو خرج بغير عذرٍ ساعةً بطل اعتكافه

(খাজানাতুল মুফতীন, পৃষ্ঠা ১০৩২,১০৩৩)

ডা. সাইদুল আনওয়ার
ঢাকা

প্রশ্ন: ফেইসবুকে শায়খ বিন বাজের একটি ভিডিও দেখলাম যেখানে তিনি বলেছেন নামাযের দুই সিজদার মধ্যবর্তী বৈঠকে দুআ পড়া ওয়াজিব, না পড়লে নামায হবে না। একাকী নামাযে বা ইমামতীতে থাকলে সাহু সিজদাহ আবশ্যক হবে। এ বিষয়ে সঠিক ফাতওয়া কী? আমিতো অনেক সময় দুই সিজদার মধ্যবর্তী বৈঠকে দুআ করি না। আমার নামায হবে কি?

জবাব: সকল মাযহাবের অধিকাংশ ফকীহগণের নির্ভরযোগ্য সিদ্ধান্ত অনুযায়ী নামাযে দুই সিজদার মধ্যবর্তী বৈঠকে দুআ পড়া ওয়াজিব কিংবা সুন্নাত নয়। কোনো কোনো ফিকহবিদ একে মুস্তাহাব বলেছেন। তাই এতে কোন দুআ না পড়লে তাতে নামাযের কোন ক্ষতি হবে না। এর কারণে সাহু সিজদার কোনো প্রয়োজন নেই। এ সম্পর্কে আল বিনায়াহ শারহুল হিদায়াহ কিতাবে লিখেছেন-

وليس بين السجدتين ذكر مسنون. وعن الحسن بن أبي مطيع أنه يقول: سبحان الله والحمد لله أستغفر الله العظيم. وعند الشافعي: يستحب أن يدعو في جلوسه بين السجدتين لما روى حذيفة أنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يقول بينهما: «اللهم اغفر لي وارحمني واهدني واجبرني وعافني وارزقني» وفي "تتمتهم": ولا يتعين عليه دعاء، ولكن يستحب أن يدعو كما وردت به السنة.

(আল বিনায়াহ শারহুল হিদায়াহ, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ২৪৮)
আল বাহরুর রাইক কিতাবে লিখেছেন-

ولَمْ يَذْكُرْ الْمُصَنِّفُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ ذِكْرًا مَسْنُونًا، وَهُوَ الْمَذْهَبُ عِنْدَنَا، وَكَذَا بَعْدَ الرَّفْعِ مِنْ الرُّكُوعِ وَمَا وَرَدَ فِيهِمَا مِنْ الدُّعَاءِ فَمَحْمُولٌ عَلَى التَّهَجُّدِ،

(আল বাহরুর রাইক, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-৩৪০)

জুলহাস আহমদ চৌধুরী
জকিগঞ্জ, সিলেট

প্রশ্ন: জিহাদ কখন ফরয হয়? জিহাদের শর্তগুলো কি কি?

জবাব: জিহাদ সাধারণত ফরযে কিফায়াহ (সমষ্টিগত ফরয) যা কতিপয় মুসলমানের দ্বারা আদায় হলে অন্যান্যের পক্ষ থেকে আদায় হয়ে যায়। তবে বিশেষ তিন অবস্থায় তা 'ফরযে আইন' তথা ব্যক্তিগত ফরয। অর্থাৎ প্রত্যেক সক্ষম ব্যক্তির উপর জিহাদ করা ফরয হয়ে পড়ে। যথা-

এক. যদি কাফির ও মুসলিমদের মাঝে যুদ্ধ বেধে যায় তাহলে যুদ্ধে সক্ষম প্রতিটি ব্যক্তির উপর জিহাদ করা ফরযে আইন। এই যুদ্ধ থেকে পলায়ন করা কবীরা গুনাহ।

আল্লাহ তাআলা বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفًا فَلَا تُوَلُّوهُمُ الْأَدْبَارَ – وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِّقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَىٰ فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ ۖ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ

-হে ঈমানদারগণ, তোমরা যখন কাফিরদের সাথে মুখোমুখী হবে (যুদ্ধে অবতীর্ণ হবে) তখন পশ্চাদপসরণ করবে না। আর যে লোক সেদিন তাদের থেকে পশ্চাদপসরণ করবে, অবশ্য যে লড়াইয়ের কৌশল পরিবর্তন কল্পে কিংবা যে নিজ সৈন্যদের নিকট আশ্রয় নিতে আসে সে ব্যতীত অন্যরা আল্লাহর গযব সাথে নিয়ে প্রত্যাবর্তন করবে। আর তার ঠিকানা হলো জাহান্নাম। বস্তুত: সেটা হলো নিকৃষ্ট অবস্থান।" (সূরা আনফাল, আয়াত-১৫ ও ১৬)

দুই. যদি কাফিররা মুসলিম দেশকে ঘিরে ফেলে, তাহলে প্রতিটি সক্ষম ব্যক্তির উপর দেশ ও মুসলিমদের ইজ্জত-আব্রু হিফাযতের স্বার্থে জিহাদ করা ফরয।

এ রকম যুদ্ধ সুশৃঙ্খলভাবে পরিচালনা করবে মুসলিম রাষ্ট্রপ্রধান। যতক্ষণ উলিল আমর হিসেবে মুসলিম রাষ্ট্রপ্রধান থাকবে ততক্ষণ সে তা নির্বাহ করবে। এটাকে বলা হয়, প্রতিরক্ষামূলক জিহাদ।

তিন. মুসলিম রাষ্ট্রপ্রধান যদি দেশের নাগরিক ও প্রজা সাধারণকে জিহাদের জন্য আহ্বান জানান (বাইরের কোনো অপশক্তির বিরূদ্ধে লড়াই করার জন্যে) তাহলে প্রত্যেক সক্ষম ব্যক্তির উপর জিহাদে অংশগ্রহণ করা ফরযে আইন হয়ে যায়। এ মর্মে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, وَإِذَا اسْتُنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوا -যখন তোমাদেরকে জিহাদে বের হওয়ার জন্য আহ্বান জানানো হয়, তখন তোমরা (জিহাদের উদ্দেশে) বের হয়ে যাও।" (সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৪৭২৩)

যারা এই আহ্বান পাওয়ার পরও তাতে সাড়া দেয় না, আল্লাহ তাআলা তাদেরকে তিরস্কার করে বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمُ انفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اثَّاقَلْتُمْ إِلَى الْأَرْضِ ۚ أَرَضِيتُم بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الْآخِرَةِ ۚ فَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ

"হে ঈমানদারগণ, তোমাদের কি হল, যখন আল্লাহর পথে (জিহাদে) বের হবার জন্যে তোমাদের বলা হয়, তখন মাটি জড়িয়ে ধরো, তোমরা কি আখিরাতের পরিবর্তে দুনিয়ার জীবনে পরিতুষ্ট হয়ে গেলে? অথচ আখিরাতের তুলনায় দুনিয়ার জীবনের উপকরণ অতি অল্প।" (সূরা তাওবা, আয়াত-৩৮)

তাই মুসলমানের ইমাম তথা রাষ্ট্রপ্রধান যখন জিহাদের জন্য আহ্বান জানাবেন এবং অন্যান্য মুসলিমগণ জিহাদে যাবেন তখন সক্ষমতা থাকাবস্থায় অবশ্যই তাতে সাড়া দেওয়া ফরয।

মুহাম্মদ আবদুল্লাহ
সুনামগঞ্জ

প্রশ্ন: ১ চার রাকাআত বিশিষ্ট নামাযের চতুর্থ রাকাআতের পর না বসে ভুলবশত দাঁড়িয়ে গেলে করণীয় কি?

প্রশ্ন:২ চার রাকাআত বিশিষ্ট নামাযের শেষ রাকাআতে শরীক হলে পরে কিভাবে তাশাহ্হুদ পড়তে হবে? জানতে চাই।

জবাব:১ এমতাবস্থায় ৫ম রাকাআতের সিজদা করার পূর্বে স্মরণ হলে সঙ্গে সঙ্গে বসে যাবে এবং তাশাহ্হুদ পড়ে ডান দিকে সালাম ফিরিয়ে সাহু সিজদাহ করবে এবং পুনরায় তাশাহহুদ, দরূদ ও দুআ মাসূরা পড়ে সালাম ফিরিয়ে নামায শেষ করবে। আর ৫ম রাকাআতের সিজদা করে ফেললে ফরয নামায বাতিল হয়ে তা নফল নামাযে স্থানান্তরিত হবে। কেননা এর দ্বারা চতুর্থ রাকাআতের বৈঠক সংশোধনের কোনো সম্ভাবনা আর অবশিষ্ট নেই, যা ফরয ছিল। তাই এমতাবস্থায় ৫ম রাকাআত পূর্ণ করে আরো এক রাকআতসহ মোট ৬ রাকাআত পড়ে সালাম ফিরিয়ে নামায শেষ করবে। উক্ত নামাযের সকল রাকাআত নফল হিসেবে পরিগণিত হবে। এমতাবস্থায় নির্ভরযোগ্য অভিমত অনুযায়ী সাহু সিজদাহ লাগবে না। আর মূল চার রাকাআত ফরয নামায পুনরায় দোহরাতে হবে। (মুখতাছারুল কুদুরী, ১/৩৪; আল লুবাব, ১/৯৭; আল জাওহারাতুন নায়্যিরাহ, ১/৭৮; কানজুদ্দাকাইক, ১/১৮৩; তাবয়ীনুল হাক্বাইক, ১/১৯৬; আল ইনায়াহ শরহুল হিদায়াহ, ১/৫০৮; আল বিনায়াহ, ২/৬১৯)

জবাব:২ যে কোনো নামাযের জামাআতে কেউ শরীক হলে রাকাআত পাওয়ার ক্ষেত্রে রুকু পাওয়া শর্ত। সুতরাং শেষ রাকাআতে ইমামকে রুকু অবস্থায় কিংবা এর আগে পেলে ঐ রাকাআত পেয়েছে বলে গণ্য হবে। তাই এমতাবস্থায় ইমামের সালাম ফিরানোর পরে তার আরো তিন রাকাআত মুনফারিদ বা একাকী পূর্ণ করতে হবে। আর ঐ রাকাআতের রুকুর পর শরীক হলে তার ঐ রাকাআত ধর্তব্য হবে না। তাই ইমামের সালাম ফিরানোর পর তাকে নতুন করে চার রাকাআত পড়তে হবে। আগে ইমামের সাথে পাওয়া অংশটুকু পূর্ণ রাকাআত না হওয়াতে তার জন্য সেটা অতিরিক্ত।

আর তাশাহ্হুদ সর্বক্ষেত্রে দ্বিতীয় ও চতুর্থ রাকাআতে (মাগরিবের নামাযে দ্বিতীয় ও তৃতীয় রাকাআতে) পড়তে হয়। ইমামের সাথে এক রাকআত পেলে মাসবুক ব্যক্তির জন্য পরবর্তী নামাযের প্রথম রাকআত হলো দ্বিতীয় রাকআত। এ রাকআতে তাকে বৈঠক করে তাশাহ্হুদ পড়তে হবে। সকল মাসবুক নামাযের ক্ষেত্রে এরূপ হিসাব করে পূর্বের ইমামের সাথে পাওয়া রাকআতসহ মোট নামাযের দ্বিতীয় রাকআতে প্রথম বৈঠকের তাশাহ্হুদ, এবং চতুর্থ রাকাআতে শেষ বৈঠকের তাশাহ্হুদ দরূদ ও দুআয়ে মাসূরা পড়তে হবে। মাগরিবের ক্ষেত্রে শেষ বৈঠকের তাশাহ্হুদ হবে তৃতীয় রাকাআতে। ইমামের চতুর্থ রাকাআতের বৈঠকে মাসবুক ব্যক্তি তাশাহ্হুদ পরবর্তী দুআগুলো পড়বে না বরং তাশাহ্হুদ এমন ধীরে ধীরে পড়বে যেন ইমামের সালাম ফিরানোর পূর্বে তা শেষ হয়। ◘

খাতুন

ঘরোয়া

ফৌজিয়া সুলতানা জুঁই

রক্তপ্রবাহের সময় ধমনির গায়ে যে চাপ সৃষ্টি হয় তাকে রক্তচাপ (Blood Pressure) বলে। হৃৎপিণ্ডের সংকোচন বা সিস্টোল অবস্থায় ধমনির গায়ে রক্তচাপের মাত্রা সর্বাধিক থাকে। একে বলে সিস্টোলিক চাপ (Systolic Pressure) হৃৎপিণ্ডের প্রসারণ বা ডায়াস্টোল অবস্থায় রক্তচাপ সবচেয়ে কম থাকে। একে ডায়াস্টোলিক চাপ (Diastolic Pressure) বলে।

চিকিৎসকদের মতে,একজন পরিণত বয়সের মানুষের আদর্শ রক্তচাপ সাধারণত 120/80 মিলিমিটার মানের কাছাকাছি। রক্তচাপকে দুটি সংখ্যায় উল্লেখ করা হয়। প্রথমটি উচ্চমান এবং দ্বিতীয়টি নিম্নমান। রক্তের উচ্চ চাপ তথা সিস্টোলিক চাপ এর আদর্শ মান 120 মিলিমিটারের নিচে। নিম্নচাপ বা ডায়াস্টোলিক চাপ এর আদর্শ মান 80 মিলিমিটারের নিচে । এই চাপটি হৃৎপিণ্ডের দুটি বিটের মাঝামাঝি সময় রক্তনালিতে সৃষ্টি হয়। দুই ধরনের রক্তচাপের পার্থক্যকে ধমনিঘাত বা নাড়িঘাত চাপ (Pulse pressure) বলা হয়। সাধারণত সুস্থ অবস্থায় হাতের কবজিতে রেট তথা হৃৎস্পন্দনের মান প্রতি মিনিটে 60-100। হাতের কবজিতে হালকা করে চাপ দিয়ে ধরে পালস রেট বের করা যায়। স্ফিগমোম্যানোমিটার বা সংক্ষেপে বিপি যন্ত্রের সাহায্যে রক্তচাপ মাপা যায়।

রক্তচাপ এক ধরনের হৃদরোগের ইঙ্গিত দেয়, তবে এটি নিজেই একটি রোগ নয়। আমাদের অবশ্যই কারণটি বুঝতে হবে এবং খাদ্যাভ্যাস এবং জীবনযাত্রায় পরিবর্তন আনার চেষ্টা করা উচিত। সুস্থ থাকা এবং ফিট থাকা নিজের একটি দৈনন্দিন কাজ যা আপনাকে অবশ্যই অনুসরণ করতে হবে, যার জন্য প্রতিদিনের ব্যায়াম এবং একটি ভালো স্বাস্থ্যকর খাবার বাধ্যতামূলক। প্রয়োজনে সঠিক নির্দেশনার জন্য বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ করুন। কেননা, উচ্চ রক্তচাপের কারণে আমাদের মস্তিস্কে রক্ত ও রক্তে অক্সিজেনের প্রবাহ কমে যেতে পারে । এতে ব্রেনে ব্লকেজ বা ধমনী বার্স্ট হওয়ার সম্ভাবনা বেড়ে যায় যা ব্রেন স্ট্রোকের অন্যতম কারণ। ব্রেন স্ট্রোকের ফলে মস্তিস্ক কোষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। অনেক রকম শারীরিক অক্ষমতা দেখা যায়। যেমন: কথা না বলতে পারা। হাঁটা চলায় অসুবিধা। স্বাভাবিক কার্যকলাপে অসুবিধা। অবশেষে মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে।

রক্তচাপ কমানোর প্রাকৃতিক উপায়

মানুষ স্বাভাবিকভাবে রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। রক্তচাপ কমাতে প্রাকৃতিক উপায় অবলম্বন করা যেতে পারে। এখানে কিছু ঘরোয়া টিপস দেওয়া হলো যা প্রাকৃতিকভাবে রক্তচাপ কমাতে সাহায্য করবে।

(১) ব্লাড প্রেশারে ভুগছেন এমন ব্যক্তিদের খাবারে অতিরিক্ত লবণ গ্রহণ এড়িয়ে চলতে হবে। তাদের খাদ্যতালিকায় গোলাপি লবণ ব্যবহার করতে হবে।

(২) পানি পান করা স্বাভাবিকভাবে রক্তচাপ কমাতে সাহায্য করতে পারে। উচ্চ রক্তচাপে আক্রান্ত ব্যক্তিরা দৈনিক কমপক্ষে 8-10 গ্লাস পানি পান করে তাদের রক্তচাপ কমাতে পারেন।

(৩) ব্যায়াম প্রাকৃতিকভাবে রক্তচাপ কমাতে সাহায্য করতে পারে। রক্তচাপে ভুগছেন এমন ব্যক্তিদের অবশ্যই সক্রিয় থাকতে হবে এবং তাদের সহজ ব্যায়াম যেমন হাঁটা, সাঁতার কাটা, লাফানো ইত্যাদিতে নিযুক্ত থাকা উচিত।

(৪) মানসিক চাপ এবং রাগ এড়ানো স্বাভাবিকভাবে রক্তচাপ কমাতে সাহায্য করবে। ধ্যান এবং যোগব্যায়াম প্রাকৃতিকভাবে রক্তচাপ কমানোর জন্য ভালো বিকল্প।

(৫) সবুজ শাক-সবজি এবং ফলসহ সুষম খাদ্য খাওয়া উচিত। সবুজ শাক-সবজি ও ফলমূল খেলে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ে এবং রক্তচাপ কম হয়।

(৬) চর্বিযুক্ত খাবার খাওয়া এড়িয়ে চলুন এবং রক্তচাপ কমাতে ডায়েট থেকে স্যাচুরেটেড ফ্যাট বাদ দেওয়া উচিত। ওমেগা-৩ ফ্যাটি অ্যাসিড হার্টের স্বাস্থ্য বজায় রাখার জন্য ভালো।

(৭) অতিরিক্ত অ্যালকোহল এবং ধূমপান উচ্চ রক্তচাপের দুটি প্রধান কারণ। অ্যালকোহল গ্রহণ এবং ধূমপান হ্রাস করাও স্বাভাবিকভাবে রক্তচাপ কমাতে সাহায্য করে।

(৮) পর্যাপ্ত ঘুম স্বাভাবিকভাবেই রক্তচাপ কমাতে সাহায্য করে। নিয়মিত রক্তচাপ বজায় রাখার জন্য দৈনিক কমপক্ষে 7-8 ঘণ্টা ঘুমানো উচিত।

বিজ্ঞান

পরওয়ানা ডেস্ক

চাঁদের বয়স কত?

বিজ্ঞানীরা দীর্ঘদিন ধরে পৃথিবীর একমাত্র উপগ্রহ চাঁদের বয়স নিয়ে গবেষণা করছেন। সে গবেষণায় এবার নতুন তথ্য উঠে এসেছে। এতদিন তারা চাঁদের বয়স সম্পর্কে যে ধারণা পোষণ করছিলেন,উপগ্রহটির বয়স তার চেয়েও বেশি বলে সাম্প্রতিক এক গবেষণায় উঠে এসেছে। ধারণা করা হয়,মঙ্গল গ্রহের আকারের কোনো আদি গ্রহের সঙ্গে পৃথিবীর সংঘর্ষের সময় চাঁদ তৈরি হয়েছে। এটি ছিল গ্রহ তৈরি হওয়ার প্রাথমিক পর্যায়ের একটি শিলা। আর এই সংঘর্ষটি ছিল পৃথিবীর ইতিহাসে দানব আকারের প্রভাব ফেলা সর্বশেষ ঘটনা। ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম স্কাই নিউজ তাদের প্রতিবেদনে লিখেছে, বিজ্ঞানীরা চাঁদে পাথরের নমুনা সংগ্রহ করে সেই সংঘর্ষের তারিখ অনুমান করেছেন। পাথরের এইসব নমুনা চাঁদের প্রাচীন ম্যাগমা মহাসাগর থেকে স্ফটিক হয়ে গেছে বলে ধারণা করা হয়। তবে সংঘর্ষের পরেও এগুলো চাঁদের পৃষ্ঠে রয়ে যায়। এসব নমুনা বিশ্লেষণ করে বিজ্ঞানীরা বলেছিলেন,চাঁদের বয়স হতে পারে আনুমানিক ৪৩৫ কোটি বছর। তবে বিজ্ঞানভিত্তিক সাময়িকী ‘নেচার’ এ প্রকাশিত সাম্প্রতিক এক গবেষণায় ইউনিভার্সিটি অব ক্যালিফোর্নিয়া সান্তা ক্রুজ এর অধ্যাপক ফ্রান্সিস নিম্মো ও তার সহকর্মীরা যুক্তি দিয়ে বলেছেন,চাঁদের বয়স এর চেয়েও কিছুটা বেশি।

এই গবেষকদের মডেল অনুসারে চাঁদ গরম ও ঠাণ্ডা উভয় সময়ের মধ্য দিয়ে গিয়েছিল, ফলে এর পৃষ্ঠটি ঠাণ্ডা হয়ে কঠিন হওয়ার পর তা আবারও উত্তাপে গলে যায়। যার অর্থ, চাঁদের শিলার এসব নমুনা অনেক আগের সময়ের হতে পারে। এই ‘পুনরায় গলে যাওয়া’ পৃষ্ঠেই লুকিয়ে আছে চাঁদের পুরানো বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য।

চাঁদের তাপীয় মডেল,এর জ্বালামুখ ও নির্দিষ্ট কিছু খনিজ পদার্থের বয়স পর্যবেক্ষণ করে অধ্যাপক নিম্মো ও তার গবেষণা দলটি এখন ধারণা করছে, চাঁদের বয়স হতে পারে ৪৫১ কোটি বছর। অর্থাৎ আগে যে বয়স ধারণা করা হয়েছিল এর চেয়ে এখনকার হিসাবে যোগ হচ্ছে আরও ১৬ কোটি বছর। এই মুহূর্তে চাঁদের প্রতি আগ্রহ রয়েছে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের। চাঁদের দক্ষিণ মেরুতে পৌঁছানোর জন্য রীতিমতো প্রতিযোগিতা করছে এসব দেশ। তাদের ধারণা, চাঁদের দক্ষিণ মেরুতে পানি থাকতে পারে। আর মানুষকে মঙ্গল গ্রহে পৌঁছাতে সহায়তা করার জন্য চাঁদের দক্ষিণ মেরুতেই ঘাঁটি নির্মাণের পরিকল্পনা করেছে যুক্তরাষ্ট্রের মহাকাশ গবেষণা সংস্থা নাসা।

১৪ মার্চ শুক্রবার, কক্সবাজারের উখিয়ায় শরণার্থীশিবিরে অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূস ও জাতিসংঘ মহাসচিব আন্তোনিও গুতেরেস প্রায় এক লাখ রোহিঙ্গা শরণার্থীর সঙ্গে ইফতার করেছেন। সেখানে যোগ দিয়ে জাতিসংঘের মহাসচিব আন্তোনিও গুতেরেস বলেছেন, আমি এই পবিত্র রামাদান মাসে সংহতির লক্ষ্যে কক্সবাজারে এসেছি। এই সংহতি রোহিঙ্গা শরণার্থীদের সঙ্গে এবং বাংলাদেশি সম্প্রদায়ের সঙ্গে যারা রোহিঙ্গাদের এত উদারভাবে আশ্রয় দিয়েছে। আমি এখানে রোহিঙ্গাদের দুর্দশার ওপর বিশ্বব্যাপী আলোকপাত করতে এসেছি, সেই সঙ্গে তাদের সম্ভাবনার কথাও বলছি। তহবিলের কাটছাঁটের ফলে নাটকীয় প্রভাব পড়বে রোহিঙ্গা শরণার্থীদের ওপর। এর পাশাপাশি মিয়ানমারের অবনতিশীল পরিস্থিতিতে রোহিঙ্গা শরণার্থীদের এবং বাংলাদেশের সঙ্গে সংহতি এখন অতীতের যেকোনো সময়ের চেয়ে বেশি প্রয়োজন। তাই আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে সুনির্দিষ্ট সহায়তা এবং পদক্ষেপের মাধ্যমে এগিয়ে আসতে হবে। যতক্ষণ পর্যন্ত আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় তাদের পাশে না দাঁড়ায়, আমি এই ইস্যুতে কথা বলেই যাব। প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূস আঞ্চলিক ভাষায় বক্তব্য দেন। তিনি তার বক্তব্যে বলেছেন, রোহিঙ্গারা যেন আগামী বছর মিয়ানমারের রাখাইন রাজ্যে তাঁদের নিজ বাড়িতে ফিরে গিয়ে ঈদ উদ্‌যাপন করতে পারেন, সে লক্ষ্যে জাতিসংঘের সঙ্গে সম্মিলিতভাবে প্রচেষ্টা চালিয়ে যাওয়ার অঙ্গীকার করছি। ইফতারের আগে রোহিঙ্গা শিবির পরিদর্শনের সময় সেখানে শিশু, তরুণ, ইমাম ও নারী শিক্ষকদের সঙ্গে আলাদাভাবে মতবিনিময় করেন মহাসচিব। ইফতার অনুষ্ঠানে পররাষ্ট্র উপদেষ্টা মো. তৌহিদ হোসেন এবং সেনাপ্রধান জেনারেল ওয়াকার-উজ-জামান উপস্থিত ছিলেন।

এর আগে রোহিঙ্গাদের সর্বশেষ বড় জমায়েতটি ছিল ছয় বছর আগে, ২০১৯ সালের ২৫ আগস্ট। সেবার রাখাইন থেকে রোহিঙ্গা ঢলের দুই বছর পূর্তিতে উখিয়ার কুতুপালং মধুরছড়া (ক্যাম্প ৪) বিশাল তিনটি মাঠ ও পাহাড়ে জড়ো হয়েছিলেন এক লাখের বেশি রোহিঙ্গা।

গত ৬ মার্চ বৃহস্পতিবার, মাগুরায় ৮ বছরের শিশু আছিয়া বড় বোনের বাড়িতে বেড়াতে এসে বোনের শশুরের দ্বারা ধর্ষণের শিকার হয়। প্রথমে তাকে মাগুরা সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। অবস্থার অবনতি হলে সেখান থেকে স্থানান্তর করা হয় ফরিদপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে। সেখানেও তার অবস্থার কোনো উন্নতি হয়নি। পরে বৃহস্পতিবার রাতে অচেতন অবস্থায় শিশুটিকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। অবস্থার অবনতি হলে রাতে শিশুটিকে লাইফ সাপোর্ট দেওয়া হয়। অবস্থার আরও অবনতি হলে শিশুটিকে উন্নত চিকিৎসার জন্য রাজধানীর সম্মিলিত সামরিক হাসপাতালে (সিএমএইচ) স্থানান্তর করা হয়। নির্মম নির্যাতনের প্রতীক আছিয়া চিকিৎসকদের সব চেষ্টা ব্যর্থ করে ৯ দিন হাসপাতালের বেডে শুয়ে অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করার পর গত ১৩ মার্চ বেলা ২টায় মৃত্যুবরণ করে।

এই ঘটনার সঙ্গে জড়িত শিশুটির দুলাভাই। এমনটি জানিয়েছেন আছিয়ার বড় বোন। মাগুরার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মিরাজুল ইসলাম গণমাধ্যমকে জানান, শিশুকে ধর্ষণের ঘটনায় মা বাদী হয়ে চারজনের বিরুদ্ধে মামলা করেছেন। মামলার পর ইতোমধ্যে পুলিশ ও সেনাবাহিনীর যৌথ অভিযানে গ্রেফতার করা হয়েছে শিশুটির বোনের শ্বশুর হিটু শেখ ও স্বামী সজিব হোসেনকে। ধর্ষণের এই নেক্কারজনক ঘটনার পর ক্ষোভে ফুসছে সামাজিক মাধ্যম ব্যবহারকারীরা। মানুষের বিবেক কতটা নিচে নামলে ৮ বছরের একটা শিশুকে এভাবে অমানুষের মত নির্মমভাবে ধর্ষণ করতে পারে এমন প্রশ্ন নেটিজেনদের।

জানা যায়, মাগুরার শ্রীপুর উপজেলার জারিয়া গ্রামের ৩য় শ্রেণি পড়ুয়া ৮ বছরের শিশু আছিয়া রামাদান ও ঈদের ছুটিতে বেড়াতে আসে মাগুরা সদরের নিজনান্দুয়ালি মাঠপাড়া গ্রামে আপন বড় বোনের বাড়িতে। সেখানেই বৃহস্পতিবার আপন বোনের শ্বশুর হিটু শেখ দ্বারা ধর্ষণের শিকার হয় অবুঝ শিশুটি।

আছিয়ার বড় বোনের ভাষ্য অনুযায়ী তার স্বামী সজিব হোসেনও জড়িত এই ধর্ষণ কাণ্ডে। এমনকি সে নিজেই দরজা খুলে দিয়ে তার বাবাকে ঘরে ঢুকতে সাহায্য করেছে বলেও জানায় শিশুটির বড় বোন । এর আগে একাধিকবার তাকেও ধর্ষণের চেষ্টা করেছে শ্বশুর হিটু শেখ এমনটিও জানান তিনি।

সম্প্রতি বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনের অন্যতম প্রধান সমন্বয়ক হাসনাত আব্দুল্লাহর করা একটি ফেসবুক পোস্টকে ঘিরে সারাদেশ জুড়ে চলছে নানা আলোচনা। সেনা প্রধানসহ সেনাবাহিনীকে জড়িয়ে করা পোস্টটি নিয়ে ইতোমধ্যে মুখ খুলেছেন তার সহকর্মী ছাত্র আন্দোলনের সমন্বয়ক ও নাগরিক পার্টির নেতারা। হাসনাত আবদুল্লাহর মধ্যরাতে করা সেই পোস্টে তিনি দাবি করেছেন, ভারতের পরিকল্পনায় 'রিফাইন্ড আওয়ামী লীগ' নামে আওয়ামী লীগকে পুনর্বাসিত করার ষড়যন্ত্র চলছে। শুধু তাই নয়, তার পোস্টে তিনি দাবি করেন গত ১১ মার্চ দুপুরে ক্যান্টনমেন্ট থেকে নাকি তাকে আর তার আরেক সহকর্মীকে প্রস্তাব করা হয়েছে, সাবের হোসেন চৌধুরী, শিরিন শারমিন, তাপসকে সামনে রেখে নতুন করে রিফাইন্ড আওয়ামী লীগ পুনর্গঠনের। যদিও তারা এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছেন বলেও হাসনাত আব্দুল্লাহ তার পোস্টে উল্লেখ করেছেন। এদিকে ফেসবুকে পোস্ট করে সেনাবাহিনী নিয়ে হাসনাতের ফেসবুক স্ট্যাটাস সমীচীন মনে হয়নি বলে মন্তব্য করেছেন জাতীয় নাগরিক পার্টির উত্তরাঞ্চলের মুখ্য সংগঠক সারজিস আলম। এর ফলে পরবর্তীতে যেকোনো স্টেকহোল্ডারের সঙ্গে দলটির গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা আস্থার সংকটে পড়তে পারে বলেও মন্তব্য করেছেন তিনি। সারজিস তার দীর্ঘ স্ট্যাটাসে এটাও পরিষ্কার করেন সেদিন হাসনাতের সাথে আর কেউ নন স্বয়ং তিনি নিজেই ছিলেন।

সেনাপ্রধানের সাথে নরমালি তারা আওয়ামী লীগ পুনর্বাসিত হলে কি ঘটতে পারে তা নিয়ে আলোচনা করছিলেন কিন্তু সেনাপ্রধান একবারের জন্যও তাদের আওয়ামী লীগ পুনর্বাসনের জন্য চাপ প্রয়োগ করেননি।

সার্জিস তার পোস্টে আরও বলেন, হাসনাত তার বক্তব্যে আরেকটি বিষয় উল্লেখ করেছে- "আলোচনার এক পর্যায়ে বলি-যেই দল এখনো ক্ষমা চায় নাই, অপরাধ স্বীকার করে নাই,

সেই দলকে আপনারা কীভাবে ক্ষমা করে দেবেন! অপরপক্ষ থেকে রেগে গিয়ে উত্তর আসে, ইউ পিপল নো নাথিং। ইউ ল্যাক উইজডোম অ্যান্ড এক্সপিরিয়েন্স। উই আর ইন দিজ সার্ভিস ফর এটলিস্ট ফোর্টি ইয়ার্স। তোমার বয়সের থেকে বেশি।" তার মতে সেনা প্রধান এই বাক্যটি রেগে গিয়ে বলেননি বরং বয়সে তুলনামূলক বেশ সিনিয়র কেউ জুনিয়রদের যেভাবে অভিজ্ঞতার ভারের কথা ব্যক্ত করে সেই টোন এবং এক্সপ্রেশনে বলেছেন। 'হাসনাত না ওয়াকার' এই ন্যারেটিভ এবং স্লোগানকে সারজিস প্রত্যাশা করেন না বলেও জানিয়েছেন। অপরদিকে হাসনাত-সারজিসের করা এসব ফেসবুক পোস্টের পর তাদের মধ্যে কেউ একজন মিথ্যা বলছে বলে মন্তব্য করেছেন জাতীয় নাগরিক পার্টির সিনিয়র যুগ্ম মুখ্য সমন্বয়ক হান্নান মাসউদ। এই মন্তব্যের মাধ্যমে তিনি দলের মধ্যে বিভাজন এবং উত্তেজনা বাড়িয়েছেন। এদিকে আবার হাসনাতের এই মন্তব্যের প্রতিক্রিয়ায় সেনাসদর জানিয়েছে এগুলো রাজনৈতিক স্ট্যান্টবাজি ছাড়া আর কিছুই নয়। তার এই বক্তব্যকে অত্যন্ত হাস্যকার ও অপরিপক্ব গল্পের সম্ভার বলেও অভিহিত করে সেনাসদর।

সরকারি অর্থ ব্যয়ের ক্ষেত্রে জনগণের কল্যাণের পাশাপাশি স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে সচিবদের নির্দেশনা দিয়েছেন অর্থ উপদেষ্টা ড. সালেহ উদ্দিন আহমেদ। আগামী ২০২৫-২৬ অর্থবছরের বাজেট নিয়ে অর্থ মন্ত্রণালয়ে বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও বিভাগের সচিবদের সঙ্গে বৈঠক করে তিনি এ নির্দেশনা দেন। বৈঠক শেষে অর্থ উপদেষ্টা সাংবাদিকদের বলেন, যতটা সম্ভব বাস্তবায়নযোগ্য বাজেট দেওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে। প্রতিটি মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও সংস্থার অনুকূলে বাজেটের বরাদ্দ রয়েছে। এগুলো ব্যয় করার সময় জনগণের কল্যাণের বিষয়টি লক্ষ্য রেখে, একই সঙ্গে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে বলা হয়েছে সচিবদের। যথাসময়ের মধ্যে প্রকল্প শেষ করার পাশাপাশি সরকারি কাজে ধারাবাহিকতা নিশ্চিতেও তাগাদা দেওয়া হয়েছে। সব সরকারই প্রায় একই উদ্দেশ্যে বাজেট দেয় কিন্তু শেষ পর্যন্ত তা বাস্তবায়ন সম্ভব হয় না। উল্লেখ্য, আগামী অর্থবছরের জাতীয় বাজেট প্রণয়নের কাজ শুরু হয়েছে। এটি হবে বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকারের প্রথম বাজেট। আগামী জুনে নতুন বাজেট দেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়েছে। নতুন বাজেটে অগ্রাধিকার পাবে খাদ্য নিরাপত্তা, মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ এবং আর্থসামাজিক উন্নয়ন। গুরুত্ব পাবে পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর স্বার্থ। নতুন বাজেটে প্রাথমিকভাবে প্রায় ৮ লাখ ৪৮ হাজার কোটি টাকা ব্যয়ের পরিকল্পনা করা হয়েছে। এ বাজেট চূড়ান্ত করতে বিভিন্ন অংশীজনের সঙ্গে ধারাবাহিকভাবে মতবিনিময় করছেন অর্থ উপদেষ্টা।

ঢাকার সরকারি সাত কলেজের জন্য নতুন যে বিশ্ববিদ্যালয়টি হতে যাচ্ছে, সেটির নাম হবে ঢাকা সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটি (DCUC)। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনে (ইউজিসি) সাত কলেজের শিক্ষার্থী প্রতিনিধিদের সঙ্গে ইউজিসি চেয়ারম্যান এস এম এ ফায়েজসহ অন্যদের এক সভায় এ সিদ্ধান্ত হয় বলে শিক্ষার্থীদের সূত্রে জানা গেছে। সভায় উপস্থিত ইডেন মহিলা কলেজের সমাজবিজ্ঞান বিভাগের এক ছাত্রী বলেন, আজকের সভায় সবকিছু বিবেচনা করে বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য ঢাকা সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটি নামটি ঠিক করা হয়েছে। ঢাকার এই সাত সরকারি কলেজ হলো ঢাকা কলেজ, ইডেন মহিলা কলেজ, সরকারি শহীদ সোহরাওয়ার্দী কলেজ, কবি নজরুল সরকারি কলেজ, বেগম বদরুন্নেসা সরকারি মহিলা কলেজ, সরকারি বাঙলা কলেজ ও সরকারি তিতুমীর কলেজ। এসব কলেজে শিক্ষার্থী প্রায় দুই লাখ। শিক্ষক এক হাজারের বেশি। এই কলেজগুলো একসময় জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন ছিল। ২০১৭ সালের ১৭ ফেব্রুয়ারি রাজধানীর এই সাত কলেজকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত করা হয়েছিল। কিন্তু অধিভুক্ত করার পর থেকে যথাসময়ে পরীক্ষা নেওয়া, ফল প্রকাশসহ বিভিন্ন দাবিতে সময়-সময় আন্দোলন করে আসছিলেন এসব কলেজের শিক্ষার্থীরা। আট বছরে ক্ষুদ্র সমস্যাগুলো পুঞ্জীভূত হয়ে বড় রূপ নেয়। সাত কলেজের শিক্ষার্থীদের আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে গত জানুয়ারিতে এই সাত কলেজকে আবারও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আলাদা করার কথা জানায় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। ২০২৪-২৫ শিক্ষাবর্ষ থেকে এসব কলেজে আর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন শিক্ষার্থী ভর্তি করা হবে না। এরপর এই সাত বড় কলেজের জন্য পৃথক একটি বিশ্ববিদ্যালয় করার উদ্যোগ নেয় সরকার। এ জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয় ইউজিসি চেয়ারম্যান অধ্যাপক এস এম এ ফায়েজের নেতৃত্বে একটি কমিটি গঠন করে। প্রাথমিকভাবে এ কমিটি নতুন বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম 'জুলাই ৩৬ বিশ্ববিদ্যালয়' করার বিষয়ে আলোচনা করেছিল। গতকালের সভায় এই সাত কলেজের জন্য ঢাকা সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটি এবং ঢাকা ফেডারেল ইউনিভার্সিটি করার পক্ষে মত আসে।

বাংলাদেশে আশ্রয় নেওয়া রোহিঙ্গাদের জন্য সহায়তা বাড়াতে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের প্রতি আহ্বান জানিয়েছে জাতিসংঘ। জাতিসংঘের শরণার্থী সংস্থা ও আন্তর্জাতিক অভিবাসন সংস্থা অন্য সহযোগী প্রতিষ্ঠানগুলোর সাথে মিলে বাংলাদেশে অবস্থানরত রোহিঙ্গাদের জন্য প্রায় ৯৪ কোটি ডলার সহায়তা দিতে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের প্রতি অনুরোধ জানিয়েছে। মায়ানমারের সহিংসতা থেকে পালিয়ে বাংলাদেশে আশ্রয় নিয়েছে প্রায় ১৫ লাখ রোহিঙ্গা। এদের সবাই খাবারের জন্য সাহায্য সংস্থাগুলোর দেওয়া মানবিক সহায়তার ওপর নির্ভরশীল। রোহিঙ্গা এবং তাদের আশ্রয় দেওয়া বাংলাদেশের জন্য প্রয়োজনীয়তা নিরূপণ, সেই অনুযায়ী টেকসই পদক্ষেপ গ্রহণ করার উদ্দেশ্য তহবিল তৈরি করতে দুই বছর মেয়াদী একটি প্রকল্প ইতোমধ্যে শুরু হয়েছে। এর নাম দেওয়া হয়েছে ২০২৫-২০২৬ জয়েন্ট রেসপন্স প্ল্যান (জেআরপি)। বাংলাদেশ সরকারের নেতৃত্বে এই প্রকল্পে আন্তর্জাতিক অভিবাসন সংস্থা ও শরণার্থী সংস্থার পাশাপাশি ১১৩টি সহযোগী সংস্থা অংশ নিচ্ছে। এসব সংস্থার পক্ষ থেকে প্রথম বছর রোহিঙ্গা ও স্থানীয় কমিউনিটির সদস্যদের জন্য সহায়তা করতে প্রায় ৯৪ কোটি ডলার সহায়তার আবেদন জানানো হয়েছে। জেনিভায় দাতাদের কাছে রোহিঙ্গা সংকটের বর্তমান অবস্থা তুলে ধরে জাতিসংঘ কর্মকর্তারা বলেছেন, আট বছর পরে রোহিঙ্গা সংকট আন্তর্জাতিক পাদপ্রদীপের বাইরে চলে গেলেও তাদের সংকটের সমাধান হয়নি। তাদের খাদ্য সহায়তা কমিয়ে দেওয়া, রান্নার জ্বালানি বা মৌলিক আশ্রয় দিতে না পারলে বিশাল ও দুর্বল এই জনগোষ্ঠীর জন্য তা মারাত্মক ক্ষতির কারণ হতে পারে মর্মে তুলে ধরা হয়েছে। উল্লেখ্য, কিছুদিন আগে রোহিঙ্গাদের জন্য প্রতিদিনের বরাদ্দ কমানোর ঘোষণা দিয়েছিল জাতিসংঘ। এর মধ্যেই তাদের জন্য সহায়তা বৃদ্ধির এই আবেদন জানানো হলো।

কবিতা

কৃষকের ঈদ
কাজী নজরুল ইসলাম

বেলাল! বেলাল! হেলাল উঠেছে পশ্চিম আসমানে,
লুকাইয়া আছ লজ্জায় কোন মরুর গরস্থানে।
হের ঈদগাহে চলিছে কৃষক যেন প্রেত- কংকাল
কশাইখানায় যাইতে দেখেছ শীর্ণ গরুর পাল?
রোজা এফতার করেছে কৃষক অশ্রু- সলিলে হায়,
বেলাল! তোমার কন্ঠে বুঝি গো আজান থামিয়া যায়।
থালা, ঘটি, বাটি বাঁধা দিয়ে হের চলিয়াছে ঈদগাহে,
তীর খাওয়া বুক, ঋণে- বাঁধা- শির, লুটাতে খোদার রাহে।
জীবনে যাদের হররোজ রোজা ক্ষুধায় আসে না নিদ
মুমুর্ষ সেই কৃষকের ঘরে এসেছে কি আজ ঈদ?
একটি বিন্দু দুধ নাহি পেয়ে যে খোকা মরিল তার
উঠেছে ঈদের চাঁদ হয়ে কি সে শিশু- পাঁজরের হাড়?
আসমান- জোড়া কাল কাফনের আবরণ যেন টুটে।
এক ফালি চাঁদ ফুটে আছে, মৃত শিশুর অধর পুটে।
কৃষকের ঈদ!ঈদগাহে চলে জানাজা পড়িতে তার,
যত তকবির শোনে, বুকে তার তত উঠে হাহাকার।
মরিয়াছে খোকা, কন্যা মরিছে, মৃত্যু- বন্যা আসে
এজিদের সেনা ঘুরিছে মক্কা- মসজিদে আশেপাশে।
কোথায় ইমাম? কোন সে খোৎবা পড়িবে আজিকে ঈদে?
চারিদিকে তব মুর্দার লাশ, তারি মাঝে চোখে বিঁধে
জরির পোশাকে শরীর ঢাকিয়া ধণীরা এসেছে সেথা,
এই ঈদগাহে তুমি ইমাম, তুমি কি এদেরই নেতা?
নিঙ্গাড়ি’ কোরান হাদিস ও ফেকাহ, এই মৃতদের মুখে
অমৃত কখনো দিয়াছ কি তুমি? হাত দিয়ে বল বুকে।
নামাজ পড়েছ, পড়েছ কোরান, রোজাও রেখেছ জানি,
হায় তোতাপাখি! শক্তি দিতে কি পেরেছ একটুখানি?
ফল বহিয়াছ, পাওনিক রস, হায় রে ফলের ঝুড়ি,
লক্ষ বছর ঝর্ণায় ডুবে রস পায় নাকো নুড়ি।
আল্লা- তত্ত্ব জেনেছ কি, যিনি সর্বশক্তিমান?
শক্তি পেলো না জীবনে যে জন, সে নহে মুসলমান।
ঈমান! ঈমান! বল রাতদিন, ঈমান কি এত সোজা?
ঈমানদার হইয়া কি কেহ বহে শয়তানি বোঝা?
শোনো মিথ্যুক! এই দুনিয়ায় পুর্ণ যার ঈমান,
শক্তিধর সে টলাইতে পারে ইঙ্গিতে আসমান।
আল্লাহর নাম লইয়াছ শুধু, বোঝনিক আল্লারে।
নিজে যে অন্ধ সে কি অন্যরে আলোকে লইতে পারে?
নিজে যে স্বাধীন হইলনা সে স্বাধীনতা দেবে কাকে?
মধু দেবে সে কি মানুষে, যাহার মধু নাই মৌচাকে?
কোথা সে শক্তি- সিদ্ধ ইমাম, প্রতি পদাঘাতে যার
আবে- জমজম শক্তি- উৎস বাহিরায় অনিবার?
আপনি শক্তি লভেনি যে জন, হায় সে শক্তি-হীন
হয়েছে ইমাম, তাহারি খোৎবা শুনিতেছি নিশিদিন।
দীন কাঙ্গালের ঘরে ঘরে আজ দেবে যে নব তাগিদ
কোথা সে মহা- সাধক আনিবে যে পুন ঈদ?
ছিনিয়া আনিবে আসমান থেকে ঈদের চাঁদের হাসি,
ফুরাবে না কভু যে হাসি জীবনে, কখনো হবে না বাসি।
সমাধির মাঝে গণিতেছি দিন, আসিবেন তিনি কবে?
রোজা এফতার করিব সকলে, সেই দিন ঈদ হবে।

আজকে ঈদের দিন
আ. শ. ম. বাবর আলী

একটি মাসের রোযার শেষে
আজকে ঈদের দিন
মুমীনকে দেন খুশির খবর
রাব্বুল আলামীন।

রামাদানে রাখলো রোযা
করলো ইবাদত
আজকে যে ঈদ তার জন্যই
খোদার রহমত।

রয়নি রোযা রামাদানে
যায়নি তারাবীতে
উজ্জ্বলতার খুশি তায় আজ
ঈদ কি পারে দিতে?

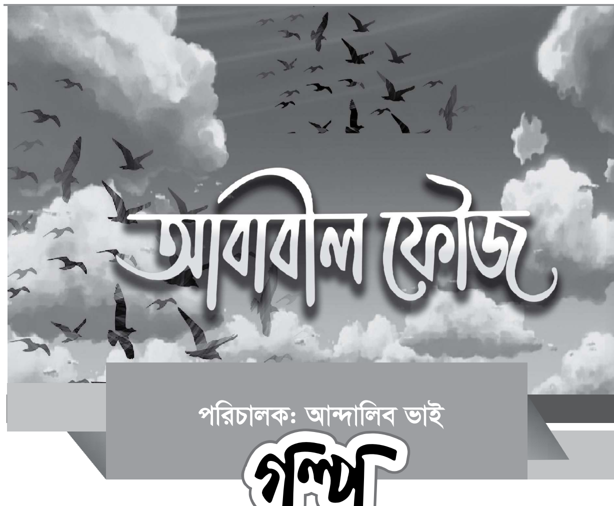

ধৈর্যের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ নবী আইউব (আ.)

জামান আহমদ

হযরত আইউব (আ.) ছিলেন হযরত ইবরাহীম (আ)-এর অধস্তন বংশধর। আল্লাহ তাআলা তাঁকে নবী হিসেবে পৃথিবীতে প্রেরণ করেছিলেন। তিনি ছিলেন সে সময়কার একজন বড় ধনাঢ্য ব্যক্তি। গৃহপালিত পশু, দাস-দাসী এবং তার অঞ্চলের বিশাল বিশাল জমির মালিকানাসহ সকল প্রকার সম্পদের অধিকারী। ইবন আসাকির (র.) বর্ণনা করেন, হযরত আইউব (আ) এর এসকল সম্পত্তি ছাড়াও তার বেশ কজন সন্তানসন্ততি ছিল। হযরত আইউব (আ.) এর ওপর যখন ঈমানের পরীক্ষা এলো তখন তিনি দুরারোগ্য ব্যধিতে আক্রান্ত হলেন। যা দীর্ঘদিন স্থায়ী ছিল। আইউব (আ.) এর শরীরে এমন এক ধরনের রোগ বাসা বেঁধেছিল যার ফলে তার সমস্ত শরীরে পচন ধরে গিয়েছিল। কিছু কিছু উলামায়ে কিরাম বলেন সেটা ছিল কুষ্ঠরোগ, কেউ বলেছেন চর্মরোগ, কেউ বলেছেন বসন্ত রোগ। হযরত সুদ্দী (র.) বলেন, হযরত আইউব (আ.) এর শরীরের গোশত শুকিয়ে গিয়েছিল। শরীরে শুধুমাত্র হাড্ডি আর চামড়া বাকি ছিল। আইউব (আ.) অসুস্থ হওয়ার পর ধীরে ধীরে তার সকল সম্পদ হাতছাড়া হয়ে যায়। দূর্ঘটনার শিকার হয়ে তার সন্তানগণও মারা যান। রোগ দীর্ঘস্থায়ী হওয়ায় আপনজন, বন্ধু-বান্ধব সবাই তার কাছ থেকে সরে যেতে থাকে। তিনি শহরের অদূরে একটা জায়গায় নির্জনবাস করতে লাগলেন। সঙ্গে ছিলেন তার স্ত্রী। তিনি তার সেবাযত্ন করতেন। একদিন তার স্ত্রী তাকে বললেন, হে আল্লাহর নবী! আপনি আল্লাহর কাছে সুস্থতার জন্য দুআ করেন না কেন? আইউব (আ.) বললেন, আমি সত্তর বছর পর্যন্ত সুস্থ-স্বাভাবিক, বর্ণাঢ্য জীবনযাপন করেছি, এখন যদি অসুস্থ অবস্থায় আমি আরও সত্তর বছর অতিবাহিত করি তারপরও তা কম হবে। এতসব মুসীবত সত্ত্বেও পচন ধরা শরীর নিয়ে হযরত আইউব (আ.) রাত-দিন আল্লাহর যিকরে রত থাকতেন। কারও প্রতি কোনো অভিযোগ করেননি বরং বিপদ-আপদ, কষ্ট যত বৃদ্ধি পেয়েছে ততই তিনি সহনশীলতা, ধৈর্য ও আল্লাহর যিকর বাড়িয়ে দিয়েছেন।

ইয়াযীদ ইবন মাইসারাহ (র.) বলেন, আল্লাহ তাআলা যখন আইউব (আ.) এর কঠিন পরীক্ষা নিচ্ছিলেন তখন শয়তান তাকে ধোঁকা দেওয়ার চেষ্টা করেছিল। আইউব (আ.) তখন বললেন, হে আমার প্রতিপালক! আপনি আমাকে ধনসম্পদ, সন্তানসন্ততি দান করেছিলেন তখন আমার অন্তর ঐ সকল বস্তুর প্রতি আকৃষ্ট ছিল। আমি ঠিকমতো আপনার ইবাদাত করতে পারিনি এখন আমার এসব ধ্বংস হয়েছে অতএব পার্থিব বস্তুর আকর্ষণ থেকে আমার অন্তর এখন মুক্ত। আপনার ও আমার মাঝে আর কোনো প্রতিবন্ধকতা নেই। আমি নিরিবিলি আপনাকে স্মরণ করতে পারবো। আমার প্রতি আপনার এই ইহসানের কথা যদি ইবলীস জানতে পারে তাহলে সে আমার প্রতি হিংসা করবে। আইউব (আ.) এই ধৈর্যশীলতা পরবর্তী যুগে প্রবাদে পরিণত হয়ে গিয়েছে। কুরআনে আল্লাহ বলেছেন, এবং স্মরণ কর আইউবের কথা, যখন সে তার প্রতিপালককে ডেকে বলেছিল, হে আমার রব! আমি দুঃখ-কষ্টে পড়েছি। তুমি তো দয়ালুদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ দয়ালু। (সূরা আম্বিয়া: ৮৩) হযরত আইউব (আ.) মোট কত বছর রোগাক্রান্ত ছিলেন এ ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে। বিভিন্ন কিতাবে তিন, সাত, তের, আঠারো বছরের বর্ণনা পাওয়া যায়। যাইহোক, এসব বর্ণনা থেকে এটা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, সুদীর্ঘ সময় তিনি রোগাক্রান্ত ছিলেন। আব্দুল্লাহ ইবন উবাইদ উমার (র.) থেকে বর্ণনা করেন, হযরত আইউব (আ.) এর দুই ভাই ছিল। একদিন তারা তাকে দেখার জন্য আসলো। কিন্তু দুর্গন্ধের কারণে তারা আইউব (আ.) এর নিকট যেতে পারলো না। দূরে দাঁড়িয়ে একে অপরকে বলতে লাগলো, আইউব যদি ভালো কাজ করতো তবে আল্লাহ তাকে এইরূপ বিপদে ফেলতেন না। একথা শুনে আইউব (আ.) প্রকম্পিত হয়ে আল্লাহর দরবারে বললেন, হে আল্লাহ! আপনি জানেন, কোনো ব্যক্তি ক্ষুধার্ত আছে শুনে আমি কখনো তৃপ্তি সহকারে আহার করিনি অতএব আপনি আমার সত্যতা প্রমাণিত করুন। আপনি জানেন, কোনো ব্যক্তি উলঙ্গ আছে শুনে আমি কখনো অধিক কাপড় পরিধান করিনি, অতএব আপনি আমার সত্যতা প্রমাণিত করুন। সঙ্গে সঙ্গে আকাশ থেকে এর সত্যতার ঘোষণা আসলো। তারা দুই ভাই সেটি শ্রবণ করলো। অতঃপর আইউব (আ.) সিজদায় অবনত হলেন। তিনি আল্লাহ তাআলার দরবারে তার কষ্টের কথা জানিয়ে মুনাজাত করলেন। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আইউব (আ.) কে জানিয়ে দিলেন, তুমি তোমার পা দ্বারা মাটিতে আঘাত কর। আইউব (আ.) আল্লাহর নির্দেশ মুতাবিক নিজের পা দিয়ে মাটিতে আঘাত করলেন; সাথে সাথে মাটির নিচ থেকে পানির ঝরণাধারা প্রবাহিত হলো। যা ছিল সুশীতল। আইউব (আ.) সেই সুশীতল পানি পান করলেন এবং গোসল করলেন। ফলে, তার দেহের সমস্ত ব্যথা-বেদনা, ক্ষত দূর হয়ে গেল। তিনি আরোগ্য লাভ করলেন। এমনভাবে আরোগ্য লাভ করলেন, যেন তার কিছুই হয়নি। আগের মতো সুস্থ, সবল ও সুদর্শন হয়ে উঠলেন। কুরআন মাজীদে আইউব (আ.) এর এই সুস্থ হয়ে ওঠার বর্ণনা এসেছে এভাবে− (আল্লাহ বলেন) তুমি তোমার পা দিয়ে ভূমিতে আঘাত কর; ঝরণা নির্গত হলো গোসল করার জন্য ও পান করার জন্য। আমি তাকে দিলাম তার পরিবারবর্গ ও তাদের মত আরও অনেক। এটা আমার পক্ষ থেকে রহমতস্বরূপ এবং বুদ্ধিমানদের জন্যে উপদেশস্বরূপ। (সূরা ছোয়াদ: আয়াত ৪২-৪৩)

মুফাসসিরীনে কিরাম বলেন, হযরত আইউব (আ.) এর চৌদ্দজন সন্তান ছিলেন। কারও কারও মতে, সুস্থ হওয়ার পর আল্লাহ তাআলা আইউব (আ.) এর পূর্বের সন্তানদেরকে জীবিত করে দেন। আবার কারও মতে, পূর্বের সন্তানদের বিনিময়ে পরবর্তীতে আইউব (আ.) এর ঔরসে আরও চৌদ্দজন সন্তানসন্ততি দান করেন। এছাড়াও, তিনি তার সমস্ত সম্পদও ফেরত পান। আল্লাহ তাআলা হযরত আইউব (আ.) কে দীর্ঘ সময় শারীরিক অসুস্থতা দিয়ে মূলত পরীক্ষায় ফেলেছিলেন এবং তিনি ধৈর্যের পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে সফলতার সাথে সেই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছিলেন। আল্লাহ বলেন, নিশ্চয়ই আমি তাকে ধৈর্যশীল পেয়েছি। সে কতই না উত্তম বান্দা! নিশ্চয়ই সে ছিল প্রত্যাবর্তনশীল। (সূরা ছোয়াদ: আয়াত ৪৪)

ঈদ মুবারক
আলিম উদ্দিন আলম

সিয়াম সাধনার মাসের পরে
আনন্দ খুশি আজ ঘরে ঘরে
বিলিয়ে দাও মন সবার তরে
ভেদাভেদ ভুলে যাও সকল সুহৃদ
ঈদ এসেছে ঈদ-ঈদ মুবারক ঈদ

ঈদের নামাযে আজ সকাল সাজে
আল্লাহর প্রেম জাগে সবার মাঝে
শপথ করো তবে সকল কাজে
থাকবেনা অভিমান আর কোন জিদ
ঈদ এসেছে ঈদ- ঈদ মুবারক ঈদ।

ফিরনি পায়েশ কতো পিঠাপুলি
মিষ্টি বুলি আর কুলাকুলি
ভালোবাসা দাও সবে প্রানটা খুলি
ঈদের আমেজে আজ চোখে নাই নিদ
ঈদ এসেছে ঈদ-ঈদ মুবারক ঈদ

ঈদের খুশির ধুম
জামান আহমদ

সিয়ামের দিনগুলো শেষ হয়ে গেলো
আকাশেতে ফের এক নবচাঁদ এলো
দিকে দিকে ছড়ায় ঈদের খুশির ধুম
তাক্বাব্বালাল্লহু মিন্না ওয়া মিনকুম।

মাস ভরা ঘিরেছিল অগণিত রহমত
পথভোলা কতজনে পেয়েছে যে সৎ পথ
জান্নাতে খোলা ছিল রাইয়্যানী সেই দ্বার
গুনাহ-খাতা জ্বলেপুড়ে হয়েছে যে ছারখার
আনন্দ-উল্লাসে মাতে ফিতরের মৌসুম
তাক্বাব্বালাল্লহু মিন্না ওয়া মিনকুম।

প্রভু দেবেন রোযার বদলা আজ নিজ হাতে
রাগ-অভিমান-বিবেদ ভুলে চল রে একসাথে
নতুন জামায় খুশবু মেখে যাবো ঈদগাহে
সালাত-সালাম, মুআনাকা সবই খোদার রাহে
মুমিন হৃদয়জুড়ে ফুটুক জান্নাতী কুসুম
তাক্বাব্বালাল্লহু মিন্না ওয়া মিনকুম।

পল্লী গাঁয়ের ঈদ
আব্দুর রকিব

সন্ধ্যাকাশে মুচকি হাসে ডিঙির মতো চাঁদ
রোজা শেষে ঈদ এসেছে ভাঙলো খুশীর বাঁধ ।
হৈ হুল্লোরে উঠলো জেগে আবার পাড়া গাঁও
ভিড়লো যেনো গাঁয়ের ঘাটে পণ্য বোঝাই নাও ।

খোকাখুকি উঠোন জুড়ে আনন্দে খায় পাক
কেউবা দাদুর গল্প শোনে ঘুমিয়ে ডাকায় নাক ।
কুরআন পড়ে কেউবা তুলে রবের কাছে হাত
পূণ্যময়ী রাতের মাঝে আছে যে ঈদ রাত ।

তেলের পিঠা ভাজতে মায়ের ব্যস্ত দুটি হাত
পুলক মুখর পল্লী— যেনো দীর্ঘ ঈদের রাত ।
খোকা খুকির সয়না তো আর ভোর যে কতো দূর
আসবে কবে মিনার হতে ভোর আজানের সুর?

গোসল শেষে ঈদের জামা হর্ষে পড়ে গায়
ঈদ জামাতে যায় খোকা মা পেছন দিকে চায়।
জামাত শেষে কোলাকুলি জড়িয়ে বুকে বুক
পল্লী গাঁয়ের ঈদের মাঝে অন্য রকম সুখ ।

দুখিদের ঈদ
ইয়াকুব আহমদ

ঈদ মানে হাসি ঠিক সব মুখ হাসে না
কারো চোখ জল ভরা, সুখ পেয়ে ভাসে না।
কারো দুখ প্রিয়জনে, কারো দুখ টাকাতে
কারো সুখ ভেসে যায় চাকরিতে, ঢাকাতে।

কারো ঘরে পাক হয় বিরিয়ানি, লাচ্ছি
কেউ বলে জল খেয়ে ঈদগাহে যাচ্ছি!
কারো জামা বেশ দামি কেউ কিছু পায় না
কারো দেহে ছেঁড়া জামা মাঠে যেতে চায় না।

কারো দুখ "বাবা নেই" কেউ দুখি মায়েতে
চুমো দেয়া হয় না যে ঘরে এসে পায়েতে।
কারো ঈদ দূর দেশে বিষাদের দিন তা
একা একা ঈদ কাটে স্বজনের চিন্তা।

ঈদ এলে
মো. তাইফুর রহমান

ঈদ এলে ভাই মনে খুশি
উৎসব ঘরে ঘরে
উল্লাসে মন ভরে
তাইতো সবাই সবার সাথে
কোলাকুলি করে ।

রোযাদারের ঈদ আনন্দ
অনেক বেশি আছে
শান্তিতে মন নাচে
ঈদ এলে ভাই স্বজনদেরকে
পাই যে আমি কাছে ।

ঈদ নামাযে অংশ নিতে
সবাই দলে দলে
ঈদগাহেতে চলে
ঈদ মুবারক ঈদ মুবারক
মুখে সবাই বলে।

খুশি নিয়ে বছর ঘুরে
ঈদ যে আবার আসে
সবাই সুখে হাসে
এই কামনা সবাই যেন
থাকে সবার পাশে ।

ঈদ আনন্দে শিশুরা তো
করে মজার খেলা
কাটায় সুখে বেলা
ঘরে ঘরে ফিরনি-সেমাই
যেন খুশির মেলা ।

রাজনীতি
সেলিম আহমদ কাওছার

রাজনীতির সঠিক ধারা
যারা লালন করে
জনগণের ভালোর জন্য
জীবন ভরে লড়ে।

সে রাজনীতি এই সমাজে
নেই আর বিদ্যমান
নেতা-নেত্রীরা মঞ্চে উঠে
শোনায় নোংরা গান।

রাজনীতি তাই ঘৃণ্য পথে
হাঁটছে দিবা রাতি
চোর বাটপার নেতা সেজে
করছে দেশের ক্ষতি।

এই সমাজে রাজার নীতি
মিথ্যা কথা বলা
সত্য কথা বলতে গেলে
মুখে দিবে তালা।

রাজার দোষে রাজ্য নষ্ট
প্রজা কষ্ট পায়
রাজনীতির এ বেহাল দশায়
দেশ অশান্ত হায়!

রাজনীতির হোক সঠিক চর্চা
নোংরামি সব ছেড়ে
দেশের কল্যাণ মানব সেবায়
আসুন সবাই ফিরে।

জীবনে কিছুই নাই
মুহাম্মদ আলম জাহাঙ্গীর

কোথায় সৌন্দর্য, কোথায় রঙ আর অনুপাত?
কোথায় ভাষা, কোথায় মর্যাদা ও পদমর্যাদা ?
কোথায় সম্পদ আর কোথায় টাকা?
কোথায় সেই অহংকার আর কোথায় আমোদ-প্রমোদ?
সাজিয়ে গুজিয়ে মন জুড়িয়ে রাখলি।
তারা অটল থাকলে লাশ নিয়ে বড়াই কোথায়?
পরম করুনাময়ের তাকওয়া ছাড়া আর কিছুই নাই।

আমি সম্পূর্ণ হারাম!
মিথ্যায় ভরা!
আমি গীবত পূর্ণ ছিলাম!
আমি অন্যায় পূর্ণ!
আমি উত্তরাধিকার খেয়ে তৃপ্ত!
এতিমের টাকা খেয়ে আমি ভরা!

কোথায় অহংকার!
কোথায় অহংকার!
শক্তি কোথায়!
বাগ্মিতা কোথায়!
সুন্দর ঘ্রাণ কোথায়!
লাবণ্য কোথায়!

প্রস্তুত আমার খাটিয়া।
হে আল্লাহ, আমাদেরকে একটি সুন্দর সমাপ্তি দান করুন
হে বিশ্বজগতের প্রভু!

অশ্রুসিক্ত কাহিনী
নোমান আহমেদ মাছুম

ফিলিস্তিন করছে শোষণ
ইজরায়েল বাহিনী।
ধ্বংস'স্তূপ চালাচ্ছে রোজ
অশ্রুসিক্ত কাহিনী।

আজ কি মুসলিম তুমি
থাকবে বিরোধী মতে।
চলো এবার সবাই মিলে
হাঁটি বিপ্লবের পথে।

বাজি রাখিবো তব জীবন
তবুও আনবো বিজয়।
নির্যাতিত মজলুমেরা তবে
হাসিবে খুলে হৃদয়।

তাদের আঁখি অশ্রু জড়া
আমাকে কাঁদায় রোজ।
আমার যদি থাকতো ক্ষমতা
ক্ষুধার্ত'কে করাই'তাম ভোজ।

আমি আমার ইচ্ছে গুলো
করিলাম কবিতা'য় ব্যক্ত।
যুদ্ধের ডাক আসে যদি
জড়ায়ে দিবো রক্ত।

রাসূল (সা:) এর ভালোবাসা
রাকিব হাছান

কখনো কি রাসূলের ভালোবাসায় হারিয়ে গিয়েছি ?
বরং নারীর ভালোবাসায়
পথ ভুলে মাতাল হয়ে রয়েছি!

রাসুলের সুন্নায় কি চুল কেটেছি?
বরং ইহুদি খ্রিস্টানদের সুন্নায় ডুবে গেছি।
টুপি আতর পাঞ্জাবি করি নি সঙ্গী
এইসব যারা পড়ে তাদের বলি জঙ্গী!

ঈমানদাররা কখনো করবে না ভয়
তাদের হৃদয়ে তো আল্লাহ আর রাসূল ছাড়া আর কিছু নয়।

মুসলমানদের কয়েকটি আবিষ্কার

পাশ্চাত্য বিজ্ঞানীদের সম্পর্কে আমরা অনেকেই অনেক কিছু জানি। তবে মুসলমানদের আবিষ্কার সম্পর্কে অনেক কিছুই রয়ে যায় জানার বাইরে, যেগুলো শুনলে আপনারা অবাক হবেন, হবেন বিমোহিত। 'মুসলিম ভিলেজ' জার্নালে বর্ণিত তথ্য সংকলনের মাধ্যমে মুসলমানদের আবিষ্কার সম্পর্কে অনেক তথ্য সন্নিবেশিত হয়েছে। আজ থাকল মুসলমানদের আরও ৫টি অজানা আবিষ্কার সম্পর্কে কিছু তথ্য-

৬. চর্মবিজ্ঞান

আলী ইবনুল-আব্বাস আল-মাজুসী, তিনি হ্যালি আব্বাস নামে পরিচিত। তাকে প্রাচীন চিকিৎসকদের একজন বলে মনে করা হয় যিনি প্রথম বলেছিলেন, স্পন্দনশীল শিরা (অর্থাৎ ধমনী) ও অস্পন্দনকারী শিরাগুলোর মধ্যে একটি কৈশিক নেটওয়ার্ক রয়েছে। এরপর ইংরেজ চিকিৎসক হার্ভে (১৫৭৮–১৬৫৮ খ্রি.) কৈশিকের রক্ত সঞ্চালনের বর্ণনা দিয়ে এই চিকিৎসার কৃতিত্ব দাবি করেন। আল মাজুসী জরায়ুকে প্রভাবিত করে টিউমার অপসারণ এবং ঘাড়ের প্রদাহের বর্ণনাও দিয়েছেন। এজন্য তাকে চর্মবিজ্ঞানের জনক বলা হয়।

৭. জোতির্বিদ্যা ও তুলনামূলক ধর্মতত্ত্ব

আল-বিরুনী ছিলেন বহুবিদ্যার অধিকারী। জ্যামিতি থেকে জ্যোতির্বিদ্যা সকল ছিল তাঁর নখদর্পনে। তিনি বলেছিলেন, "আমি জ্যামিতি দিয়ে শুরু করেছি এবং পাটিগণিত আর সংখ্যার বিজ্ঞানে ভর করেছি। তারপর মহাবিশ্বের কাঠামো আর জ্যোতিষশাস্ত্রে চলেছি, জ্যোতিষীর শৈলী এবং শিরোনামের যোগ্য কেউ নয়, যিনি বিজ্ঞানের জন্য এগুলোর সাথে পুরোপুরি পরিচিত নন।" আল বিরুনীকে ইসলামিক ফার্মাসির জনক ও তুলনামূলক ধর্মতত্ত্বের জনক নামে অভিহিত করা হয়। টলেমির অনেক পূর্বে তিনি জোত্যিষ শাস্ত্রের নানা দিক উন্মোচন করেছিলেন।

৮. বীজগণিত

মুহাম্মাদ ইবন মূসা আল খাওয়ারিজমী বীজগণিতের জনক হিসেবে সর্বাধিক খ্যাত। আল খাওয়ারিজমী গণিত, ভূগোল, জ্যোতির্বিজ্ঞান এবং মানচিত্রবিদ্যায় অবদান বীজগণিত ও ত্রিকোণমিতিতে উদ্ভাবনের ভিত্তি স্থাপন করেছিল। রৈখিক ও দ্বিঘাত সমীকরণ সমাধানে তার পদ্ধতিগত দৃষ্টিভঙ্গি বীজগণিতের বিকাশ ঘটায়, যা তার গ্রন্থ আল জাবর থেকে ''অ্যালজাবরা'' নামটির উদ্ভব হয়।

৯. আধুনিক দর্শন

আল ফারাবী, ইসলামী আরব নয়াপ্লাতোবাদের প্রতিষ্ঠাতা। তাকে আধুনিক দর্শন শাস্ত্রের জনক হিসেবে অভিহিত করা হয়। আল ফারাবী দর্শন ছাড়াও যুক্তিবিদ্যা ও সঙ্গীত-এর ন্যায় জ্ঞানের বিস্তর শাখায় অবদান রাখেন।

১০. বিশ্ব মানচিত্র

মুহাম্মাদ আল-ইদরিসী ১১৫৪ সালে প্রথম সমগ্র বিশ্বের মানচিত্র এঁকেছিলেন। এজন্য তাকে বিশ্ব মানচিত্রের জনক হিসেবে অভিহিত করা হয়। ১৫৪০ সালে জেরার্ড মার্কেটর ইদরিসীর এই মানচিত্রকে আধুনিকীকরণ করেন। পাশ্চাত্য সমাজ বর্তমান সময়ে তাকে মানচিত্রের জনক হিসেবে অভিহিত করে থাকে। (চলবে)

গ্রন্থনাঃ মোহাম্মদ সিদ্দীক হায়দার

বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত আরবী শব্দ

১৪৮. طُوْلٌ كَلَامٌ (তুলুন কালাম): বাংলারূপ **তুলকালাম**। তুমুল ঝগড়া, বাক্ বিতণ্ডা, Niosy quarrel.

১৪৯. طِلِسْمَاتٌ (তিলিসমাত): বাংলারূপ **তিলিসমাত**। নাটকীয়, Dramatic.

১৫০. طَفْرَةٌ (তাফরাহ): বাংলারূপ **তড়পানো**। বিজলী চমকানো, Flounce.

১৫১. طُرَّةٌ (তুররাহ): বাংলারূপ **তোড়া**। গুচ্ছ, স্তবক, Bunch. যেমন- ফুলের তোড়া।

১৫২. طَلَاقٌ (তালাক): বাংলারূপ **তালাক**। বিবাহ বিচ্ছেদ, Divorce.

গ্রন্থনা: মোহাম্মদ খছরুজ্জামান

আন্দালিব ভাই সমীপে...

প্রিয় আন্দালিব ভাই

পরওয়ানা মার্চ সংখ্যা হাতে পেলাম। রামাদানের আবহে মুড়ানো প্রচ্ছদটা মন কাড়ে। সিয়াম সাধনার মাস বিবেচনায় একটি চমৎকার প্রচ্ছদ হয়েছে। এরকম মনোরম প্রচ্ছদে এ সংখ্যাটি সাজানোর জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ পরওয়ানা পরিবারকে।

সাজিদ আওফী সাহিল
বনশ্রী, রামপুরা, ঢাকা

-আন্দালিব ভাই

পরওয়ানার প্রতি তোমার ভালোবাসাকে মুবারকবাদ। মার্চ সংখ্যার প্রচ্ছদ তোমার ভালো লেগেছে শুনে খুশি হলাম। নিয়মিত তোমার অভিব্যক্তি জানাতে ভুলবে না কিন্তু। চিঠির জন্য তোমাকে ধন্যবাদ।

সদস্য কুপন

প্রিয় আন্দালিব ভাই, আমি ‘আবাবীল ফৌজ’ এর সদস্য হতে চাই। আমার বয়স ১৬ বছরের বেশি নয়। আমি ফৌজের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে নিজেকে সচেষ্ট রাখবো।

নাম: --

পিতা/অভিভাবক: --

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান: ------------------------------ শ্রেণি: ----------

গ্রাম: -------------------- ডাক: --------------------

থানা: -------------------- জেলা: --------------------

কুপনটি পূরণ করে ডাকযোগে নিচের ঠিকানায় অথবা ছবি তুলে ই-মেইলে পাঠিয়ে দাও।

আন্দালিব ভাই
পরিচালক, আবাবীল ফৌজ
মাসিক পরওয়ানা

বি.এন টাওয়ার, ২৮/১ বি, দৈনিক বাংলা মোড়, মতিঝিল, ঢাকা-১০০০

সিলেট অফিস: পরওয়ানা ভবন ৭৪, শাহজালাল লতিফিয়া আ/এ, সোবহানীঘাট সিলেট-৩১০০

Mobile: 01799 629090, E-mail: parwanaafbd@gmail.com

প্রিয় আন্দালিব ভাই

আমি পরওয়ানার নিয়মিত পাঠক। পরওয়ানার সকল লেখার পাশাপাশি জীবন জিজ্ঞাসা বিভাগটি আমার ভীষণ ভালো লাগে। অনেক অজানাকে জানার সুযোগ হয় এ বিভাগের মাধ্যমে। আবাবীল ফৌজের ছোট ছোট গল্প ও ছড়া-কবিতাগুলোও বেশ মজাদার হয়। পরওয়ানা পরিবারকে ধন্যবাদ সুন্দর সুন্দর জিনিস উপহার দেওয়ার জন্য।

মো. মিজানুর রহমান
হযরত শাহজালাল দারুচ্ছুন্নাহ ইয়াকুবিয়া কামিল মাদরাসা,
সোবহানীঘাট, সিলেট

আন্দালিব ভাই,

পরওয়ানার বিভিন্ন বিভাগ তোমার ভালো লাগে শুনে খুশি হলাম। আবাবীল ফৌজে তুমিও অংশগ্রহণ করতে পারো। পরওয়ানা নিয়মিত পড়ার পাশাপাশি তোমার বন্ধুদেরও পাঠক বানাবে। তোমার জন্য শুভকামনা রইল।

প্রিয় আন্দালিব ভাই

পরওয়ানায় অনেকেই চিঠি লিখেন। আমি পড়িও নিয়মিত। কিন্তু জানি না কীভাবে লিখতে হয়। সাহস করে তোমাকে লিখে পাঠালাম। আশা করি উত্তর দিবেন।

হাসানুল হক আব্দুল্লাহ
জামিয়া হোসাইনিয়া আসআদুল উলূম নূরানী কিন্ডারগার্টেন ও
হাফিযিয়া মাদরাসা
শাহজালাল উপশহর, সিলেট

আন্দালিব ভাই

কথায় আছে, সাহসে লক্ষী। তুমি সাহস করে লিখেছ বলেই তো তোমার উত্তর দিয়ে দিলাম। এবার সাহস বেড়েছে তো? তুমি যেভাবে চিঠি লিখেছ এভাবেই সবসময় লিখে যাও কেমন। তোমার জন্য শুভকামনা রইল।

প্রিয় আন্দালিব ভাই

আবাবীল ফৌজের লেখাগুলো আমার ভীষণ ভালো লাগে। আমি খুব মনোযোগ সহকারে আবাবীলের লেখাগুলো পড়ি। আমি জানতে চাই আমিও কী লিখতে পারব এ বিভাগে?

ইসমাইল হোসেন তামীম
বায়তুন নূর মাদরাসা, মেরাদিয়া, রামপুরা, ঢাকা

আন্দালিব ভাই

তুমি আবাবীল ফৌজের একজন যত্নশীল পাঠক জেনে খুশি হলাম। তোমাকে ফৌজের পক্ষ থেকে অভিনন্দন। হ্যাঁ, অবশ্যই তুমিও লিখতে পারো এ বিভাগে। ছোট গল্প, ছড়া-কবিতা, হাসতে জানিসহ শিশুতোষ যেকোনো বিষয়ে লিখতে পারো স্বাচ্ছন্দ্যে।

আন্দালিব ভাইয়ের চিঠি

প্রিয় বন্ধুরা!
রহমত, মাগফিরাত ও নাজাতের মাস মাহে রামাদান আমাদের থেকে বিদায় নেওয়ার পথে। এ মাসে মহান আল্লাহ তাঁর অসংখ্য বান্দা-বান্দিকে ক্ষমা করে দিবেন। নাজাত পেয়ে আল্লাহর প্রিয় হবেন অনেকেই। এ মাসের শেষ দশকে রয়েছে হাজার মাসের চেয়ে উত্তম একটি রজনী। আমরা যেন এই রজনীতে ইবাদতের মধ্যদিয়ে আমাদের ভাগ্যকে সুপ্রসন্ন করতে পারি।

বন্ধুরা!
রামাদানের বিদায়ের সাথে সাথে আকাশে বাঁকা চাঁদের হাসিতে আগমন করবে ঈদুল ফিতর। আনন্দ আর হৈ-হুল্লোড়ে কাটবে তোমাদের দিন। তবে আনন্দের পাশাপাশি পথশিশু ও গরীবদেরকে ঈদ আনন্দে সম্পৃক্ত করতে তাদের প্রতি সহযোগিতার হাত প্রসারিত করতে হবে। ধনী-গরীব সবাই যেন ঈদ মুবারক বলতে পারেন। আমাদের জাতীয় কবির ভাষায়–

পথে পথে আজ হাঁকিব বন্ধু
ঈদ মুবারক আসসালাম!
ঠোঁটে ঠোঁটে আজ বিলাব শিরনী ফুল-কালাম!
বিলিয়ে দেওয়ার আজিকে ঈদ!
আমার দানের অনুরাগে- রাঙা 'ঈদগা'রে!
সকলের হাতে দিয়ে দিয়ে আজ আপনারে–
দেহ নয়, দিল হবে শহীদ।

ঈদের ছুটি তোমাদের কাটুক অনেক আনন্দে। সবাইকে জানাচ্ছি ঈদ মুবারক।

ইতি
তোমাদেরই আন্দালিব ভাই

বলতো দেখি?

এ সংখ্যার প্রশ্ন

১. বিশ্ব মানচিত্রের জনক কে?
২. মুসীবতনামা কার লেখা?
৩. শিশু আছিয়া কবে মৃত্যুবরণ করেন?
৪. সরকারি সাত কলেজের জন্য প্রস্তাবিত বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম কী?
৫. ইমাম হুসাইন (রা.) এর উপনাম কী ছিল?

গত সংখ্যার উত্তর

১০ রামাদান, ৮ম হিজরী

১৭ রামাদান, ২য় হিজরী

৫৮৪ হিজরী, রামাদান মাস

৯২ হিজরীর রামাদান মাস

১০ রামাদান, ১৫ হিজরী

যাদের উত্তর সঠিক হয়েছে [প্রথম তিনজন পুরস্কৃত]
মো:রাশেদ আলম, তাফসীরুল কোরআন দাখিল মাদরাসা, জালালপুর, দক্ষিণ সুরমা, সিলেট # মোঃ- আজিজুর রহমান, ব্রাহ্মণবাজার, কুলাউড়া, মৌলভীবাজার # আব্দুল্লাহ আল হোসাইন, জালালপুর,দক্ষিণ সুরমা, সিলেট # এম. সাহাব উদ্দিন, জায়ফরনগর, জুড়ী, মৌলভীবাজার # মোঃ- আজিজুর রহমান, ব্রাহ্মণবাজার, কুলাউড়া, মৌলভীবাজার # সুমাইয়া ইয়াছমিন মুন্নি, হযরত শাহখাকী (র.) ইসলামিয়া আলিম মাদরাসা, জুড়ী, মৌলভীবাজার # সাহেরা আক্তার মুক্তা, ছাতক সরকারি কলেজ, সুনামগঞ্জ # আব্দুস সামাদ, বাদে ভূকশিমইল, ভূকশিমইল, কুলাউড়া, মৌলভীবাজার # মোঃ খলিলুর রহমান, বরুনা হাজীপুর মোহাম্মদিয়া লতিফিয়া দাখিল মাদরাসা,শ্রীমঙ্গল,মৌলভীবাজার # ইয়াফিজ কবির চৌধুরী,মোহাম্মদিয়া ইসলামিয়া হাফিজয়া দাখিল মাদরাসা, টি.বি গেইট, সিলেট # আবূ সুফিয়ান সাদী, হযরত গোলাবশাহ র. হাফিযিয়া মাদরাসা, ইমামবাড়ি, বিয়ানীবাজার, সিলেট # মো. জুমান আহমদ, হযরত শাহজালাল লতিফিয়া মাদরাসা, গোলাপগঞ্জ, সিলেট # মো. আবূ সুফিয়ান সাদী, হযরত শাহজালাল লতিফিয়া মাদরাসা, গোলাপগঞ্জ, সিলেট # কাজী মোঃ জাকির হোসেন, সদরঘাট (কাজী বাড়ি), সদরঘাট, নবীগঞ্জ, হবিগঞ্জ # রেদওয়ান আলম হৃদয়, দারুননাজাত সিদ্দীকিয়া কামিল মাদরাসা, ডেমরা, ঢাকা # কামরান হোসেন, সিলেট ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি, শামীমাবাদ, সিলেট # সৈয়দ আশরাফুল ইসলাম সানি, ভানুগাছ চৌমুহনী হাফিজিয়া মাদরাসা, কেরামত নগর, কমলগঞ্জ, মৌলভীবাজার # মামুন উর রশীদ, ভানুগাছ চৌমুহনী হাফিজিয়া মাদরাসা, পো:কেরামত নগর, উপজেলাঃকমলগঞ্জ, জেলাঃ মৌলভীবাজার # মোঃ তামবীর হাসান রুহান, জায়ফরনগর উচ্চ বিদ্যালয়, জুড়ী-৩২৫১, মৌলভীবাজার # হাফিজ মিজানুর রহমান, দিনারপুর ফুলতলী গাউছিয়া হাফিজিয়া মাদরাসা, নবীগঞ্জ, হবিগঞ্জ।

শব্দকল্প

১	২	■	৩		৪
■	৫	৬		■	
৭	■		■	৮	
৯			■		■
	■		■	১০	১১
	■		■	১২	

সূত্র : পাশাপাশি

১। পিতামহ ৩। নিজস্ব কোনো আকৃতি নেই যে বস্তুর কিন্তু আয়তন আছে ৫। প্রতিলিপি, অনুলিপি, ডুপ্লিকেট ৮। ইমারত তৈরি আবশ্যকীয় মৌলিক উপাদান ৯। কোমল ১০। বছরের বারো ভাগের একভাগ ১২। তুরস্কের মুদ্রা

সূত্র : উপর-নীচ

২। স্বত্ব ত্যাগ করে বিতরণ ৩। নিচে অবস্থিত অংশ ৪। কপাল ৬। পিতামাতা ও গুরুজনের পায়ে চুম্বন ৭। গাছের আকারকে ছোট করার কৃত্রিম জাপানী পদ্ধতি ৮। একাধিক লোকের অধিকারভুক্ত ১১। হাঁড়ি-কলসির ঢাকনা

গত সংখ্যার সমাধান

সা	হ	রী	■	ফাঁ
হা	র	■	অ	সি
বা	তা	য	ন	■
■	ল	■	ল	তা

গত সংখ্যার শব্দকল্পের পরিকল্পনাকারী
মো. নাছির উদ্দিন তালহা
হযরত শাহজালাল দারুচ্ছুন্নাহ ইয়াকুবিয়া কামিল মাদরাসা, সোবহানীঘাট, সিলেট

শব্দকল্পে যাদের উত্তর সঠিক হয়েছে (প্রথম তিনজন পুরস্কৃত)

কাজী মোঃ জাকির হোসেন, সদরঘাট (কাজী বাড়ি), সদরঘাট, নবীগঞ্জ, হবিগঞ্জ # রেদওয়ান আলম হৃদয়, দারুননাজাত সিদ্দীকিয়া কামিল মাদরাসা, ডেমরা, ঢাকা # কামরান হোসেন, সিলেট ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি , শামীমাবাদ, সিলেট # সৈয়দ আশরাফুল ইসলাম সানি, ভানুগাছ চৌমুহনী হাফিজিয়া মাদরাসা, পো:কেরামত নগর, উপজেলাঃকমলগঞ্জ,জেলাঃ মৌলভীবাজার # মামুন উর রশীদ, ভানুগাছ চৌমুহনী হাফিজিয়া মাদরাসা, পো:কেরামত নগর, উপজেলাঃকমলগঞ্জ, জেলাঃ মৌলভীবাজার # মোঃ তামবীর হাসান রুহান, জায়ফরনগর উচ্চ বিদ্যালয়, জুড়ী-৩২৫১, মৌলভীবাজার # হাফিজ মিজানুর রহমান, দিনারপুর ফুলতলী গাউছিয়া হাফিজিয়া মাদরাসা, নবীগঞ্জ, হবিগঞ্জ # এম.সাহাব উদ্দিন, জায়ফরনগর, জুড়ী, মৌলভীবাজার # মোঃ- আজিজুর রহমান, ব্রাহ্মণবাজার, কুলাউড়া, মৌলভীবাজার # সুমাইয়া ইয়াছমিন মুন্নি, হযরত শাহখাকী (র.) ইসলামিয়া আলিম মাদরাসা, জুড়ী, মৌলভীবাজার # সাহেরা আক্তার মুক্তা, ছাতক সরকারি কলেজ, সুনামগঞ্জ # আব্দুস সামাদ, বাদে ভূকশিমইল, ভূকশিমইল, কুলাউড়া, মৌলভীবাজার # মোঃ খলিলুর রহমান, বরুনা হাজীপুর মোহাম্মদিয়া লতিফিয়া দাখিল মাদরাসা,শ্রীমঙ্গল,মৌলভীবাজার # ইয়াফিজ কবির চৌধুরী,মোহাম্মদিয়া ইসলামিয়া হাফিজয়া দাখিল মাদরাসা,টি.বি গেইট, সিলেট # আবূ সুফিয়ান সাদী, হযরত গোলাবশাহ র. হাফিযিয়া মাদরাসা, ইমামবাড়ি, বিয়ানীবাজার, সিলেট # মো:রাশেদ আলম, তাফসীরুল কোরআন দাখিল মাদরাসা, জালালপুর,দক্ষিণ সুরমা,সিলেট # এম.সাহাব উদ্দিন, জায়ফরনগর, জুড়ী, মৌলভীবাজার।

বর্ণকল্প

এ সংখ্যার বর্ণকল্প

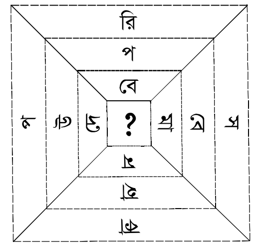

বর্ণগুলো এলোমেলা আছে। এগুলো সাজিয়ে কেন্দ্রের ফাঁকা ঘরে একটি মাত্র বর্ণ বসালে চারটি অর্থবোধক শব্দ তৈরি হবে। চেষ্টা করে দেখতো অর্থসহ শব্দ চারটি তৈরি করতে পারো কি না! সঠিক উত্তরদাতাদের নাম আগামী সংখ্যায় ছাপা হবে।

গত সংখ্যার সমাধান

রমজানের ঐ রোযার শেষে
এলো খুশির ঈদ

গত সংখ্যার বর্ণকল্পের পরিকল্পনাকারী
আজিম উদ্দিন মাছুম
হযরত শাহজালাল দারুচ্ছুন্নাহ ইয়াকুবিয়া কামিল মাদরাসা, সোবহানীঘাট, সিলেট

যাদের উত্তর সঠিক হয়েছে

কাজী মোঃ জাকির হোসেন, সদরঘাট (কাজী বাড়ি), সদরঘাট, নবীগঞ্জ, হবিগঞ্জ # রেদওয়ান আলম হৃদয়, দারুননাজাত সিদ্দীকিয়া কামিল মাদরাসা, ডেমরা, ঢাকা # কামরান হোসেন, সিলেট ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি , শামীমাবাদ, সিলেট # সৈয়দ আশরাফুল ইসলাম সানি, ভানুগাছ চৌমুহনী হাফিজিয়া মাদরাসা, পো: কেরামত নগর, উপজেলাঃ কমলগঞ্জ, জেলাঃ মৌলভীবাজার # মামুন উর রশীদ, ভানুগাছ চৌমুহনী হাফিজিয়া মাদরাসা, পো: কেরামত নগর, উপজেলাঃ কমলগঞ্জ, জেলাঃ মৌলভীবাজার # মোঃ তামবীর হাসান রুহান, জায়ফরনগর উচ্চ বিদ্যালয়, জুড়ী-৩২৫১, মৌলভীবাজার # হাফিজ মিজানুর রহমান, দিনারপুর ফুলতলী গাউছিয়া হাফিজিয়া মাদরাসা, নবীগঞ্জ, হবিগঞ্জ # রুহুল ইসলাম তুন্না, সাংগঠনিক সম্পাদক, জালালপুর ইউনিয়ন তালামীয, দক্ষিণ সুরমা, সিলেট # এম.সাহাব উদ্দিন, জায়ফরনগর, জুড়ী, মৌলভীবাজার # মোঃ- আজিজুর রহমান, ব্রাহ্মণবাজার, কুলাউড়া, মৌলভীবাজার # সুমাইয়া ইয়াছমিন মুন্নি, হযরত শাহখাকী (র.) ইসলামিয়া আলিম মাদরাসা, জুড়ী, মৌলভীবাজার # সাহেরা আক্তার মুক্তা, ছাতক সরকারি কলেজ, সুনামগঞ্জ # আব্দুস সামাদ, বাদে ভূকশিমইল, ভূকশিমইল, কুলাউড়া, মৌলভীবাজার # মোঃ খলিলুর রহমান, বরুনা হাজীপুর মোহাম্মদিয়া লতিফিয়া দাখিল মাদরাসা, শ্রীমঙ্গল, মৌলভীবাজার # ইয়াফিজ কবির চৌধুরী, মোহাম্মদিয়া ইসলামিয়া হাফিজয়া দাখিল মাদরাসা,টি.বি গেইট, সিলেট # আবূ সুফিয়ান সাদী, হযরত গোলাবশাহ র. হাফিযিয়া মাদরাসা, ইমামবাড়ি, বিয়ানীবাজার, সিলেট # এম.সাহাব উদ্দিন, জায়ফরনগর, জুড়ী, মৌলভীবাজার # মোঃ আজিজুর রহমান, ব্রাহ্মণবাজার, কুলাউড়া, মৌলভীবাজার # আহসানা জান্নাত, বাদেদেওরাইল ফুলতলী কামিল মাদরাসা, জকিগঞ্জ, সিলেট # রাশেদ আহমদ, হাসিমপুর আহমদিয়া দাখিল মাদরাসা, কাদিপুর, কুলাউড়া, মৌলভীবাজার।

অদ্ভুত পৃথিবী

পাতাল শহর

তুরস্কের কাপাডোশিয়া অঞ্চলে একটা শহর আছে। লোকে সেটাকে বলে পাতাল শহর। শহরটার নাম ডেরিনকুয়ু। এখানে রয়েছে প্রাচীন ও রহস্যময় সব স্থাপনা।এগুলো হাজার বছর ধরে তার তার ইতিহাস ও ঐতিহ্যের জন্য বিশ্ববাসীর মনোযোগ আকর্ষণ করে চলেছে। ঐতিহাসিকরা মনে করেন শহরটির গোড়াপত্তন হয় আজ থেকে প্রায় ৩,০০০ বছর আগে। হিট্টাইট জাতিগোষ্ঠীরা নিজেদের সুরক্ষার জন্য মাটির নিচে একটি শক্তিশালী আশ্রয়স্থল গড়ে তোলে। হিট্টাইটরা বৃষ্টির পানি,বাতাসের আর্দ্রতা এবং উত্তপ্ত লাভার প্রভাবে তৈরি নরম এক শিলার সন্ধান পায় পাহাড়ের নিচে। মাটির খোঁজ পেয়ে একেক করে খনন শুরু করেছিল তারা। ডেরিনকুয়ু শহরের নির্মাণের মূল উদ্দেশ্য ছিল নিজেদের সুরক্ষা। হিট্টাইট জাতিরা জানত, বাইরের আক্রমণ বা দুর্দিনে মাটির নিচে তারা নিরাপদ থাকতে পারবে। শহরটি তৈরি হয় ২৫০ ফুট গভীরে, যাতে প্রায় ২০,০০০ মানুষ একসাথে বসবাস করতে পারত ওই শহরে। গোপন দরজা, চিমনি, সুড়ঙ্গ পথ এবং অন্য নানা ব্যবস্থা শহরটিকে নিরাপদ রাখত। সেই সঙ্গে শহরের অন্দরমহলে শুদ্ধ বাতাসের প্রবাহ ও আলো নিশ্চিত করার জন্য ১,৫০০টিরও বেশি চিমনি তৈরি করা হয়েছিল। ডেরিনকুয়ু পাতাল শহর শুধু হিট্টাইটদের ব্যবহার করেননি, পরে গৃহযুদ্ধের সময় আত্মগোপনের বাইজেনটাইনরা এই শহর ব্যবহার করে। ১৯৬৩ সালে তুরস্কের এক লোক বাড়ি মেরামত করার সময় অজান্তেই ডেরিনকুয়ু শহরের একটি গুহায় পড়ে যান। এই দুর্ঘটনার পর, প্রত্নতাত্ত্বিকরা শহরের খোঁজ শুরু করেন এবং আবিষ্কার হয় প্রায় ১৮ তলাবিশিষ্ট, গোলকধাঁধা আকৃতির এ শহর। প্রত্নতাত্ত্বিকরা সেখানে প্রার্থনালয়, আস্তাবল, তেলের ঘাঁনি, গুদামঘরসহ আরো অনেক গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনার খোঁজ পান। শহরের দ্বিতীয় তলাতে বিশেষ সমাধির সন্ধানও মেলে। এগুলো ধর্মীয় কাজকর্ম এবং মৃতদের সমাহিত করার কাজে ব্যবহৃত হত। ১৯৬৯ সালে, ডেরিনকুয়ু শহরটি পর্যটকদের জন্য উন্মুক্ত করা হয়। এখন এটি পৃথিবীর অন্যতম রহস্যময় এবং ঐতিহাসিক স্থানে পরিণত হয়েছে।

হাসতে জানি

আমার কিছু না বলার নেই!

নাসিরুদ্দীন হোজ্জার বাড়িতে তার এক বন্ধু এসেছেন বেড়াতে। সন্ধ্যায় প্রতিবেশীদের সাথে পরিচয় করাতে নিয়ে যাওয়ার সময় হোজ্জা নিজের একটি ভাল পোশাক ধার দিলেন। প্রথম বাড়িতে বন্ধুকে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার সময় এও জানালেন, এর গায়ে যে পোশাকটি দেখছেন, তা আসলে আমার।

সেখান থেকে বেরিয়ে বন্ধু মহা ক্ষ্যাপা। কী দরকার ছিল ওটা বলে আমাকে অপমান করার? হোজ্জা বন্ধুর কাছে ক্ষমা চাইলেন।

দ্বিতীয় বাড়িতে গিয়ে বললেন, এর গায়ে যে পোশাকটি দেখছেন, তা আসলে এরই। এবার তো বন্ধু আরো ক্ষ্যাপলেন। পোশাকটি নিয়ে তুমি কিছু না বলাই ভাল।

তৃতীয় বাড়িতে গিয়ে তাই হোজ্জা বললেন,ইনি আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু আর এর গায়ে যে পোশাকটি দেখছেন, সে সম্পর্কে আমার কিছু না বলার নেই!

সংগ্রহে: তোফায়েল আহমদ শিহাব
প্রভাষক, স্কলার্সহোম মেজরটিলা কলেজ, সিলেট

আবাবিল ফৌজের সদস্য হলো যারা

৩৫২২। তাসফিয়া মারজান লাবীবা
পিতা: মাওলানা কামরুল হুদা
শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান: লুমিনাস একাডেমি
গ্রাম: মীরের চক
ডাক: মঙ্গলকাটা
থানা: সদর
জেলা: সুনামগঞ্জ

৩৫২৩। কাজী হিসাম উদ্দীন
পিতা: কাজী মাহমুদুল হাসান কলন্দর
শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান: ইমাম আবূ হানিফা (র.) দারুসসুন্নাহ একাডেমি
গ্রাম: সদরঘাট
ডাক: সদরঘাট
থানা: নবীগঞ্জ
জেলা: হবিগঞ্জ

৩৫২৪। কাজী আহমদ আল জামী
পিতা: কাজী মাহমুদুল বাসিত ইসকন্দর
শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান: ইমাম আবূ হানিফা (র.) দারুসসুন্নাহ একাডেমি
গ্রাম: সদরঘাট
ডাক: সদরঘাট
থানা: নবীগঞ্জ
জেলা: হবিগঞ্জ

৩৫২৫। আফজল হোসেন
পিতা: দলা মিয়া
শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান: আছিরগঞ্জ সিনিয়র আলিম মাদরাসা
গ্রাম: বাগলা
ডাক: সালিমকোণা
থানা: গোলাপগঞ্জ
জেলা: সিলেট

৩৫২৬। মাহবুবা রহমান সিদ্দীকা
পিতা: মাওলানা মো. শুয়াইবুর রহমান
শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান: পূর্বরেঙ্গা উচ্চ বিদ্যালয়
গ্রাম: পুর্ব মদনগৌরি
ডাক: ইলাইগঞ্জ
থানা: গোলাপগঞ্জ
জেলা: সিলেট

৩৫২৭। মো: আবু সাঈদ
পিতা: আকরম আলী
শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান: রাজাকিয়া দাখিল মাদরাসা
গ্রাম: বিশ্বম্ভরপুর
ডাক: গোবিন্দগঞ্জ
থানা: ছাতক
জেলা: সুনামগঞ্জ

৩৫২৮। হাসান আহমদ
পিতা: মাওলানা ক্বারী মো. রজব আলী
শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান: সহিফাগঞ্জ এসডি মাদরাসা
গ্রাম: রহিমপুর
ডাক: ইসলামাবাদ
থানা: বিশ্বনাথ
জেলা: সিলেট

৩৫২৯। মো. মামুন আহমদ
পিতা: মো. মরতুজা আহমদ
শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান: সহিফাগঞ্জ এসডি মাদরাসা
গ্রাম: কাইয়াকাইড়
ডাক: নতুন বাজার
থানা: ওসমানীনগর
জেলা: সিলেট

৩৫৩০। মোছা. আলফিনা আক্তার সুরভী
পিতা: মরহুম ইদ্রিস মিয়া
শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান: নরসিংপুর আদর্শ হাফিযিয়া দাখিল মাদরাসা
গ্রাম: নরসিংপুর
থানা: দোয়ারা বাজার
জেলা: সুনামগঞ্জ

৩৫৩১। তানজিনা আক্তার শুভা
পিতা: মরহুম মাহমুদ আলী
শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান: নরসিংপুর আদর্শ হাফিযিয়া দাখিল মাদরাসা
গ্রাম: খাইরগাঁও
ডাক: নরসিংপুর বাজার
থানা: দোয়ারাবাজার
জেলা: সুনামগঞ্জ

৩৫৩২। ছাদির হোসেন
পিতা: দিলোয়ার হোসেন
শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান: সৎপুর কামিল মাদরাসা
গ্রাম: হিম্মতেরগাঁও
ডাক: মঙ্গলপুর বাজার
থানা: দোয়ারাবাজার
জেলা: সুনামগঞ্জ

প্রস্তাবিত ভবন

- মসজিদ
- হিফযুল কুরআন
- প্রকাশনা
- অফিস
- ভাষা প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট
- মাদরাসা
- ইয়াতীমখানা
- খানকাহ
- দাওয়াহ সেন্টার
- মেহমানখানা
- দারুল কিরাত
- গ্রন্থাগার
- স্টাডি সার্কেল
- মিলনায়তন
- তাখাস্‌সুস (হাদীস ও ফিক্‌হ)

مركز الفولتلي داكا

FULTOLI COMPLEX DHAKA

Khilgaon, Dhaka, Bangladesh

কলন্দর
প্র কা শ নী

দারুল হিকমাহ একাডেমি কমলগঞ্জ

বৈশিষ্ট্য সমূহ:

- মেধা যাচাইয়ের মাধ্যমে ভর্তি
- ইসলামি ও সাধারণ শিক্ষার সমন্বয়ে প্রণীত পাঠ্যসূচি অনুযায়ী শিক্ষাদান
- সেমিস্টার পদ্ধতিতে শিক্ষাদান, নিয়মিত মডেল টেস্ট
- কম্পিউটার শিক্ষার সুযোগ
- নিরিবিলি পরিবেশে শিক্ষাদান
- দক্ষ ও অভিজ্ঞ শিক্ষক-শিক্ষিকামণ্ডলী দ্বারা শিক্ষাদান
- গৃহ শিক্ষকের প্রয়োজন মুক্ত ক্লাসের পড়া ক্লাসেই হাতে কলমে শেখানো ব্যবস্থা
- ইংরেজি ও আরবি স্পোকেন এর ব্যবস্থা
- নিয়মিত আখলাকী তা'লীম প্রদান
- সনদপ্রাপ্ত ক্বারীগণের মাধ্যমে বিশুদ্ধ কুরআন তিলাওয়াতের বিশেষ প্রশিক্ষণ
- শিক্ষার মানোন্নয়নে ত্রি-পক্ষীয় (শিক্ষক-অভিভাবক- পরিচালনা পরিষদ) বৈঠক
- রুটিনভিত্তিক সু-শৃংখল পাঠদান ও কঠোর নিয়মানুবর্তিতা
- ইসলামী সংস্কৃতি চর্চা, বিভিন্ন ধরণের প্রতিযোগিতা, বিতর্ক, শিক্ষা সফর ইত্যাদির মাধ্যমে সৃজনশীল প্রতিভা বিকাশের সুযোগ
- সমৃদ্ধ গ্রন্থাগার
- গরীব মেধাবী শিক্ষার্থীদের জন্য বিশেষ সুযোগ

নিজস্ব পরিবহন ব্যবস্থা

প্লে শ্রেণি থেকে স্ট্যান্ডার্ড ৮ম শ্রেণি পর্যন্ত

প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক : মো. আতিকুর রহমান সাকের

সীমিত আসন

স্বল্প বেতনে অধ্যয়নের সুযোগ

ক্যাম্পাস | আলেপুর (আদমপুর রোড, চেকপোস্ট-এর দক্ষিণ পার্শ্বে) কমলগন্জ, মৌলভীবাজার।

যোগাযোগ: ০১৭১২-৬৮৬২৮২, ০১৭১২-৭৬৭২৮৪

আপনি কি ২০২৫, ২০২৬, ২০২৭ সালের মধ্যে
হজ্জ করতে চান?
মাত্র ৩১,০০০ টাকা জমা দিয়ে আজই প্রাক নিবন্ধন করুন
ওমরাহ স্পেশাল প্যাকেজ
“আমরা শ্রেষ্ঠত্বের দাবী করিনা তবে আমরা ব্যতিক্রম”
স্বত্বাধিকারী
আলহাজ্জ মাওলানা খাজা মঈনউদ্দীন আহমদ জালালাবাদী
+88 01711 838 624
জালালাবাদ হজ্জ কাফেলা
Khaja Air Liner
খাজা
Khaja
air Liner
Travel & Tours
হজ্জ ওমরাহ গ্রুপ
আন্তর্জাতিক এ্যাওয়ার্ড প্রাপ্ত বিশ্বস্ত ট্রাভেল এজেন্ট এন্ড টুরস
Govt. Licn. No :253, 511, 882
IATA
ACCREDITED AGENT
Biman BANGLADESH AIRLINES APPROVED
TURKISH AIRLINES
BRITISH AIRWAYS
Emirates
QATAR AIRWAYS
SINGAPORE AIRLINES
US-BANGLA AIRLINES
REGENT
NOVOAIR
আমাদের নিজস্ব স্টক হতে সর্বনিম্ন মূল্যে বিশ্বের যে কোন গন্তব্যের বিমান টিকেট প্রাপ্তির নিশ্চয়তা
সিলেট অফিস
সবুজ বিপনী (৩য় তলা) জিন্দাবাজার
01724 926 329, 01714 486796
www.khajaairliner.com
ঢাকা অফিস
হোটেল বকসি (২য় তলা). ফকিরাপুল
01724 691 177, 0248 313524
khajaairliner@yahoo.com

লতিফিয়া হিফযুল কুরআন একাডেমি ওসমানীনগর
LATIFIA HIFZUL QURAN ACADEMY OSMANINAGAR
(একটি অত্যাধুনিক মানসম্পন্ন আবাসিক হাফিজিয়া মাদরাসা)
বৈশিষ্ঠাবলী
সম্পূর্ণ আবাসিক ব্যবস্থাপনা
সুন্নতে নববীর পূর্ণাঙ্গ অনুসরণ
অভিজ্ঞ শিক্ষকমণ্ডলীর তত্ত্বাবধান
কম্পিউটার শিক্ষা বাধ্যতামূলক
প্রবাসী ও দূরবর্তী ছাত্রদের অভিভাবকত্ব গ্রহণ
ছাত্রদের খেলাধূলা ও শরীরচর্চার সুযোগ-সুবিধা
বোর্ড পরীক্ষায় সর্বোচ্চ ফলাফল অর্জনের নিশ্চয়তা
সর্বোচ্চ তিন বছরে হিফজ সম্পন্ন করার নিশ্চয়তা (ইনশা আল্লাহ)
একাধিক ক্লাস টেস্ট ও বিষয়ভিত্তিক মডেল টেস্ট গ্রহণ
পাঁচ বছরে দাওরাসহ ইবি, জে.ডি.সি ও দাখিল দশম শ্রেণী পর্যন্ত সাধারণ ও বিজ্ঞান শাখায় পাঠদানের ব্যবস্থা
প্রতিভা বিকাশের লক্ষে সাপ্তাহিক সেমিনার, সবিনা, বিতর্ক অনুষ্ঠান ও দেয়ালিকা প্রকাশ
সফলতার ১ যুগ
ভর্তি চলছে
বোর্ড পরীক্ষায় শতভাগ সফলতা
প্রতিবছর
১লা ডিসেম্বর থেকে ভর্তি শুরু
২রা জানুয়ারি মেধা যাচাই পরীক্ষা
নতুন ভর্তিকৃত ছাত্রদের ৫ জানুয়ারি হোস্টেলে আগমন
১লা জানুয়ারি থেকে শ্রেণি কার্যক্রম শুরু
ক্যাম্পাস
দক্ষিণ তাজপুর, ওসমানীনগর, সিলেট
যোগাযোগ
মাওলানা এম.এ রব প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক ও প্রিন্সিপাল
মশাহিদুর রহমান প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক
০১৭১৬-৯৩৯৯১৮, অফিস: ০১৭৮৫-১২৮১২৮
E-mail: moshahidurrahman@yamail.com

LATIFI HANDS

LATIFI HANDS
CHARITY WITH CLARITY

FULTALI SAHEB BARI, ZAKIGANJ, SYLHET, BANGLADESH

OUR PROJECTS

- EDUCATION
- ORPHANS
- HOUSING PROJECTS
- MASJID PROJECTS
- INFRASTRUCTURE
- SUSTAINABLE LIVELIHOODS
- AGRICULTURE SUPPORT
- WEEDING SUPPORT
- SADAQAH PROJECT
- HEALTH CARE
- EYE CARE
- GIFT
- QURBANI PROJECT
- EMERGENCY AND DISASTER RELIEF
- BLIND AND DISABLED PROJECT
- WATER PROJECT
- WIDOW SUPPORT

www.youtube.com/latifihands
www.facebook.com/latifihands

www.latifihands.org.uk

মাদ্রাসা শিক্ষাবোর্ড ও দরসে নিজামির সমন্বিত সিলেবাসে

দাখিল নবম শ্রেণিতে

ভর্তি চলছে

সীমিত আসন

আমরা ভিন্ন কেন?

- আলিম ও দরসে নিজামির সমন্বিত সিলেবাস।
- সম্পূর্ণ আবাসিক ও সার্বক্ষণিক তদারকি।
- ইলম অর্জনের পাশাপাশি আমলে অভ্যস্ত করণের পরিবেশ।
- দরিদ্র ও মেধাবী ছাত্রদের জন্য সুবিধা গ্রহণের সুযোগ।

যোগাযোগ

01700-842680, 01772-959072
01712-904501, 01737-769053

হযরত শাহজালাল (র.) লতিফিয়া মাদরাসা, গোলাপগঞ্জ

কলেজ রোড, কদমতলী, গোলাপগঞ্জ, সিলেট

লতিফ ট্রাভেলস
লতিফ হলিডেইজ
প্রতিষ্ঠা ও সাফল্যের ৬৩
লতিফ ট্রাভেলস
হজ্জ লাইসেন্স নং-২৪৯
ওমরা লাইসেন্স নং-৩১২
হজ্জ & ওমরা এজেন্ট
এয়ার টিকেট
প্যাকেজ ট্যুর
ম্যানপাওয়ার
ভিসা প্রসেসিং
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের
হজ্জ নীতিমালা অনুযায়ী (ক্রমিক নং অনুযায়ী হজ্জ যাত্রা নিশ্চিত করা হবে) পরবর্তী হজ্জের জন্য
হজ্জ রেজিস্ট্রেশন চলছে হজ্জ যাত্রা নিশ্চিত করতে আপনার
নিকটবর্তী আমাদের যেকোন শাখায় রেজিস্ট্রেশনের আজই যোগাযোগ করুন -
হযরত শাহজালাল রোড। দরগা গেইট
হোটেল হলি ইনের পার্শ্বে। সিলেট।
০১৯৭৩৩৩০৭২৯। ০১৩১৮২১০০৭৩
১১৯-১২৪ আর.বি কমপ্লেক্স
(নীচ তলা) । পূর্ব জিন্দাবাজার । সিলেট
০৮২১-৭১৪৩২২ ০১৭১১ ৩৩০ ৭২৯
latiftravels1962@gmail.com
ষ্টেশন রোড । ভার্থখলা । সিলেট
০৮২১-৭১৭৪৩৭। ৭১৪৪৭৬। ৭১৫২৪৩
০১৭১১ ০০৬ ১০৫। ০১৮৪৬ ৩৯০ ৭৮৪
latiftravels@hotmail.com
১০৪-১০৯ রোজ ভিউ কমপ্লেক্স
(নীচতলা)। শাহজালাল উপশহর। সিলেট
০৮২১ ৭২৪০০৭ ০১৭১১ ৩২২২৪৪
latiftravels@gmail.com
বিয়ানীবাজার : হাজী সিরাজ ভবন, ২য় তলা কলেজ রোড, বিয়ানীবাজার। ০১৭৭১ ১৪৪ ৬৬৬
বড়লেখা : হাবীব মার্কেট (২য় তলা), পূবালী ব্যাংক সংলগ্ন, বড়লেখা। ০১৭০০ ৭৮৮ ১৫০
মৌলভীবাজার : কুসুমবাগ শপিং সিটি (নীচতলা), কুসুমবাগ, মৌলভীবাজার। ০১৭১২ ৬৮৭ ৮৭১
শমশের নগর : এম কে রহমান ট্রেড সেন্টার, ষ্টেশন রোড, শমশের নগর। ০১৭০০ ৭৮৮ ১৫৫
ঢাকা কর্পোরেট : হক চেম্বার, (৫ম তলা), দৈনিক বাংলা মোড়, মতিঝিল, ঢাকা। ০১৯১২ ৫৭৭ ৪২৩
বিশ্বের যেকোন প্রান্ত থেকে টিকেটের সঠিক মূল্য জানুন,
ঘরে বসে নিজের টিকেট নিজেই বুকিং করুন - লতিফ ট্রাভেলস পোর্টালের মাধ্যমে
Ticketing Portal : www.latiftravels.net
latiftravels.com.bd latiftravels.com @Latiftravelsroseview

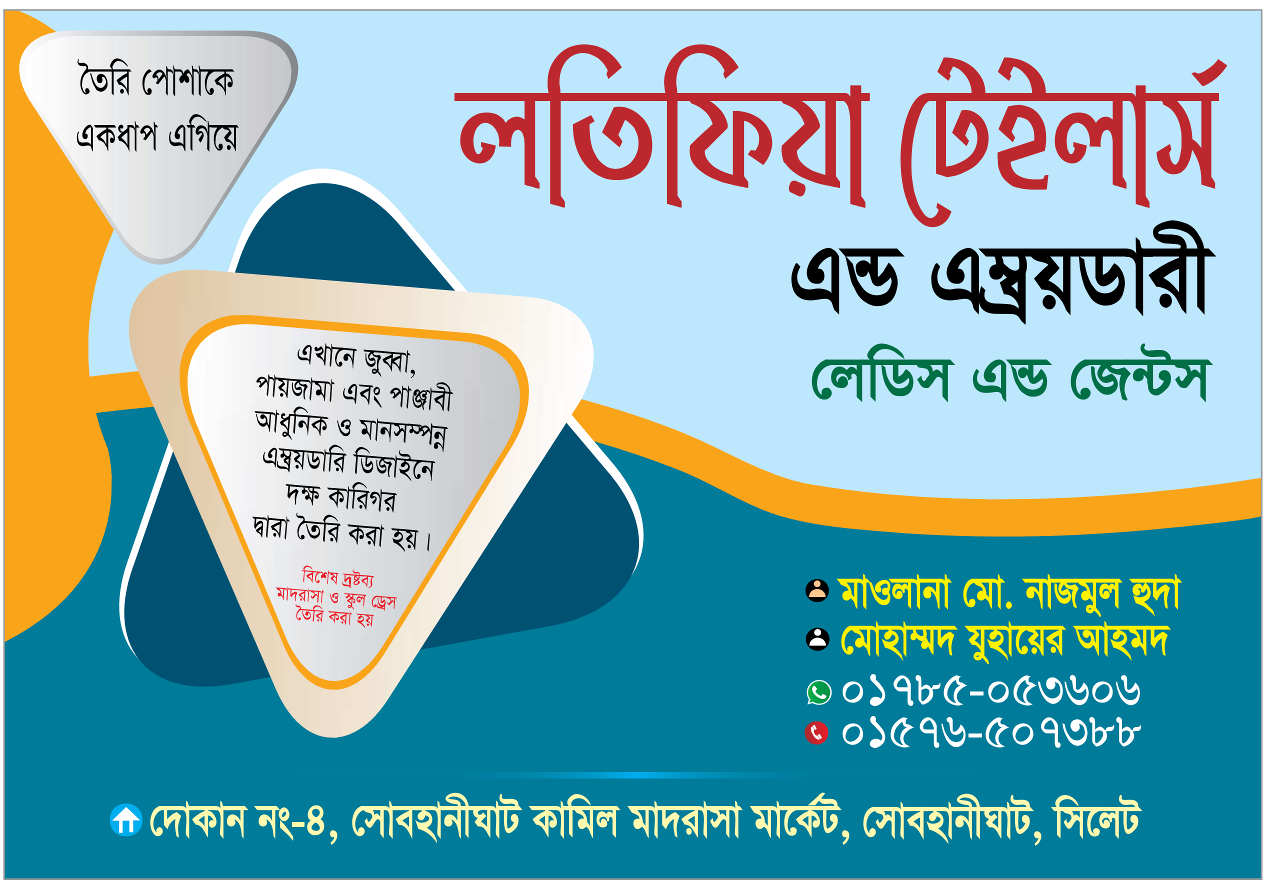
তৈরি পোশাকে একধাপ এগিয়ে
লতিফিয়া টেইলার্স
এন্ড এম্ব্রয়ডারী
লেডিস এন্ড জেন্টস
এখানে জুব্বা, পায়জামা এবং পাঞ্জাবী আধুনিক ও মানসম্পন্ন এম্ব্রয়ডারি ডিজাইনে দক্ষ কারিগর দ্বারা তৈরি করা হয়।
বিশেষ দ্রষ্টব্য
মাদরাসা ও স্কুল ড্রেস তৈরি করা হয়
মাওলানা মো. নাজমুল হুদা
মোহাম্মদ যুহায়ের আহমদ
০১৭৮৫-০৫৩৬০৬
০১৫৭৬-৫০৭৩৮৮
দোকান নং-৪, সোবহানীঘাট কামিল মাদরাসা মার্কেট, সোবহানীঘাট, সিলেট

বিশ্বের সর্বাধুনিক প্রযুক্তি, উন্নত স্বাস্থ্যসেবা
সর্বোচ্চ মান নিয়ে আমরা আছি আপনার পাশে

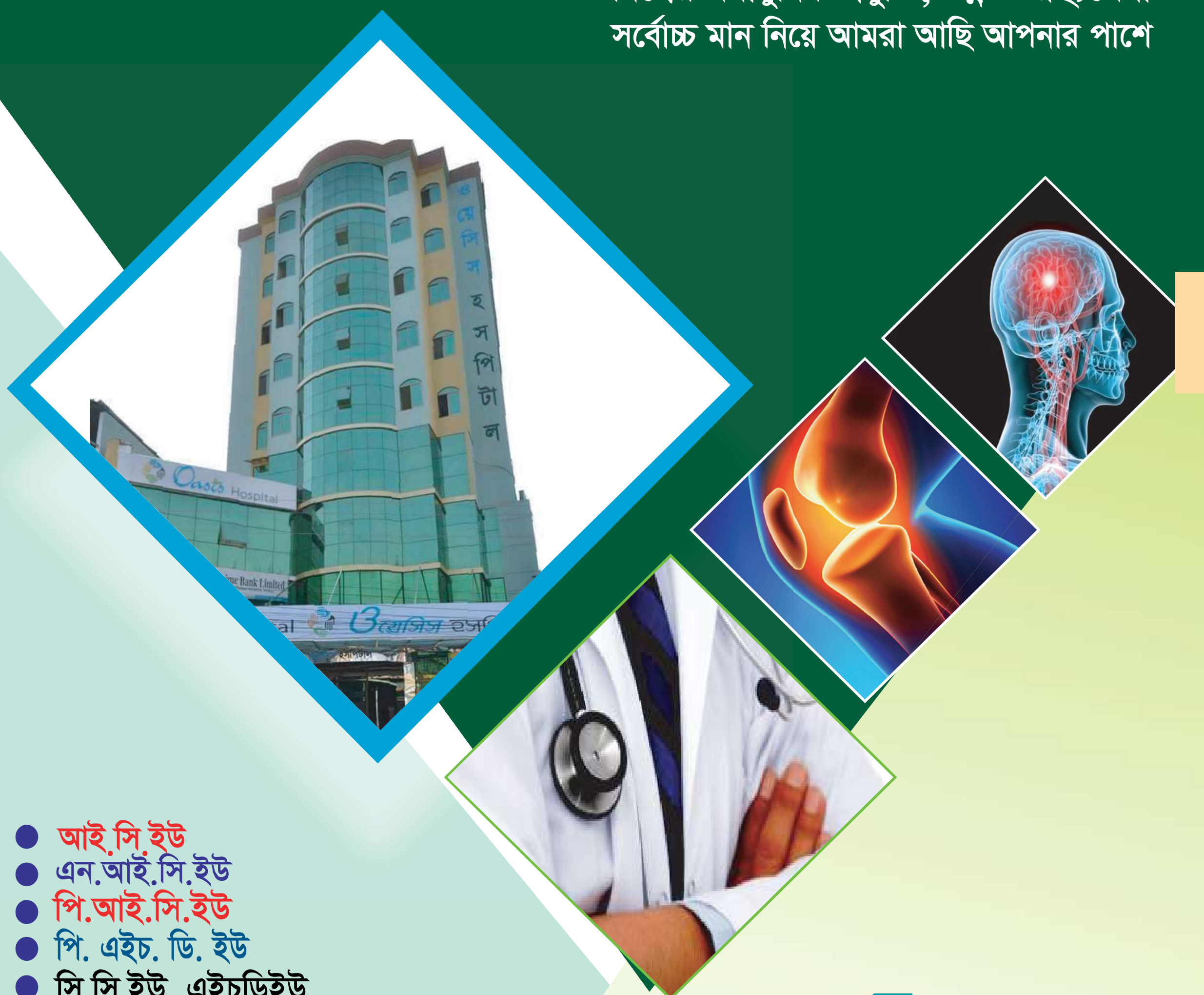

- আই.সি.ইউ
- এন.আই.সি.ইউ
- পি.আই.সি.ইউ
- পি. এইচ. ডি. ইউ
- সি.সি.ইউ, এইচডিইউ
- ডেন্টাল কেয়ার
- জেনারেল সার্জারী
- ডায়ালাইসিস ইউনিট
- নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা
- ২৪ ঘন্টা ফার্মেসী বিভাগ
- ২৪ ঘন্টা জরুরী বিভাগ
- মাদার এন্ড চাইল্ড কেয়ার
- ২৪/৭ ডায়াগনস্টিক সার্ভিস
- আই.সি.ইউ এম্বুলেন্স সার্ভিস
- ইনফার্টিলিটি (বন্ধ্যাত্ব) কেয়ার।

ওয়েসিস হসপিটাল
সোবহানীঘাট, সিলেট

Subhanighat, Sylhet

E-mail: oasishospitals@gmail.com, info@oasishospitalbd.com, Cell: 01611-990000, 01763-990055

P.O. REGD. NO. DA-1320. **THE MONTHLY PARWANA. APRIL 2025** . PRICE TK. 35

Al ISLAH

CASH & CARRY

CASH & CARRY AND WHOLESALE
OPEN TO THE PUBLIC
CATERERS ONESTOP SHOP
LARGE PARKING

WE SPECIALIZE IN FULL CATERING SUPPLIES
WE SPECIALIZE FOR YOUR FULL PACKAGING SUPPLIES
RICE, FLOUR, SPICES, TIN PRODUCT, PAULTRY, LAMB, MUTTON

290-294, BISCOT ROAD
LUTON, LU3 1AZ

01582 414154
07769 778127